একটি মহান ঘোষণা

তাহরীকে ওয়াকফে নও

(নব-উৎসর্গ)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের
ইমাম ও চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর
দিক-নির্দেশক ঐতিহাসিক পাঁচটি জুমুআর খুতবা

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

একটি মহান ঘোষণা

তাহরীকে ওয়াকফে নও

(নব-উৎসর্গ)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের
ইমাম ও চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর
দিক-নির্দেশক ঐতিহাসিক পাঁচটি জুমুআর খুতবা

ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্‌স লিঃ-এর

পক্ষে ওয়াকফে নও বিভাগ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রকাশকাল ঃ

শ্রাবণ – ১৪০৭ সাল

জুলাই – ২০০০ ইং

রবিউস সানি – ১৪২১ হিঃ

৩০০০ (তিন হাজার) কপি

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্

১১/৪, টয়েনবি সার্কুলার রোড

ঢাকা-১০০০

দু'টি কথা

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাহরীকে ওয়াকফে নও-এর ঘোষণা দিয়ে ইতিহাস বিখ্যাত হয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি শুধু মাত্র ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। ওয়াকফে নও শিশুদের কীভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে সেজন্যে পাঁচটি ঐতিহাসিক খুতবার মাধ্যমে জামাত ও ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের দিক-নিদের্শনা দান করেছেন। এ খুতবাগুলোর বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্বে পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়েছে।

এখন এ পাঁচটি খুতবা সম্বলিত একখানা পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে। জামাতী ব্যবস্থাপনা ও ওয়াকফে নও পিতা-মাতা এথেকে উপকৃত হলে আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে। এ পুস্তক প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে আল্লাহ্তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ঢাকা
২০ জুলাই, ২০০০ইং

ভূমিকা

১৯৮৭ সনের ১৩ই এপ্রিল আহমদী জামাতের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কেননা, এদিন হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) ঐশী সমর্থনে একটি অসীম কল্যাণপূর্ণ তাহরীকের সূচনা করেন। ইহা **তাহরীকে ওয়াকফে** নও নামে পরিচিত। একটি মজলিসে ইরফানে বলেন, হুযূর আনোয়ারের প্রাণে আল্লাহ্‌তাআলা খুবই প্রবল বেগে এই ধারণা প্রবিষ্ট করেন যে, আহমদীয়তের আগামী শতাব্দীতে ইসলাম ও আহমদীয়তের উন্নতির জন্যে অসংখ্য পথ উন্মোচিত হতে যাচ্ছে আর তখন অসংখ্য জীবন উৎসর্গকারীদের প্রয়োজন দেখা দেবে যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংশিষ্ট থেকে সর্বদা তবলীগের কাজে ব্যাপৃত হয়। এ মহান উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে তাহরীকে ওয়াকফে নও-এর ঘোষণা করা হয়। নিজেদের নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের প্রত্যেক দেশ থেকে জামাতের বন্ধুগণ বেশী বেশী সংখ্যায় খুবই নিষ্ঠা ও ভালবাসার আবেগের সাথে নিজেদের কলিজার টুকরাস্বরূপ সন্তানদেরকে খোদাতাআলার সমীপে এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। ঐসব পিতা-মাতা বড়ই সৌভাগ্যবান ও ঈর্ষার পাত্র যারা কিনা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত পালন করতে গিয়ে এ মহান তাহরীকের অধীনে নিজেদের সন্তানদের অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কেননা, আহমদীয়তের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসব শিশুই বড় হয়ে ইসলামের তবলীগের জন্যে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াবে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম বিস্তারে ও ইসলামের প্রতাপ এবং উহার মর্যাদা প্রচারের কাজ সাধন করবে। এদিক থেকে এ শিশুরা বড়ই মূল্যবান। কেননা, সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আইঃ) তাদেরকে এক মহা মর্যাদাপূর্ণ উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এসব শিশু এখন পিতা-মাতার নিকটে এবং একই সাথে নেযামে জামাতের নিকটে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান আমানতস্বরূপ ন্যস্ত। এ আমানতের সংরক্ষণ এবং তা'লীম ও তরবীয়তের দায়িত্ব পিতা-মাতা ও নেযামে জামাতের ওপরে ন্যস্ত। সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার পিতা-মাতা ও নেযামে জামাতের এসব দায়িত্বের ব্যাপারে খুবই বিস্তারিতভাবে স্বীয় খুতবাসমূহে বর্ণনা করেছেন। উৎসর্গের তাৎপর্য, লালন-পালন, তরবীয়ত, পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেবার গুরুত্ব এবং পেশা নির্ধারণ, মোটকথা আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের কর্মসূচী বলে দিয়েছেন।

প্রথম এসব খুতবার সংক্ষিপ্তসার "তাহরীকে ওয়াকফে নও ও হামারে যিম্মাদারীয়াঁ" - নামে ছাপানো হয়েছে। এখন মোকাররম মোহতরম চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব, ওকীল ওয়াকফে নও এ খুতবাগুলোকে ছেপে বন্টন করার ব্যবস্থা করেছেন যেন পিতা-মাতা খুতবাগুলোকে (পুস্তকাকারে) পাঠ করতঃ এর মধ্যে বর্ণিত নির্দেশাদির ওপরে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেন। এসব খুতবার ইংরেজী অনুবাদও হচ্ছে যেন ইংরেজী ভাষা-ভাষী লোকেরা এতদ্দ্বারা সরাসরি উপকৃত হতে পারেন।

বন্ধুগণের নিকট আবেদন এই যে, এসব ওয়াকেফীনে নও শিশুদের সর্বদা আপনাদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন যেন তারা বড় হয়ে ওয়াকফের সত্যিকারের প্রেরণা নিয়ে ইসলামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রচারে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে এবং সাইয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ)-এর আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করে ধর্মের সেবক হিসেবে মকামে মাহমুদে স্থান লাভ করতে পারে, আমিন – তাই যেন হয়।

ডাঃ শামীম আহমদ
ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ
লন্ডন

জুলাই, ১৯৯৪

তোমরা এক বিরাট উদ্দেশ্যে
এক মহান ওয়াকফের ভিত্তিতে
জন্ম নিয়েছো।

এক

বিষয় নির্দেশিকা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণে খোদার ভালবাসা লাভ হয়	১১
২।	রসূলে করীম (সঃ)-এর আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও উহার যুক্তি-যুক্ত ফলাফল	১১
৩।	রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা না থাকার নাম দুষ্কৃতি	১২
৪।	জেহাদের সাথে ভালবাসার আসল তাৎপর্য	১৪
৫।	ভালবাসার উৎকৃষ্ট চিহ্ন	১৫
৬।	রসূল (সঃ)-এর অনুপম সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণ শিক্ষা	১৬
৭।	আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুগ্রহ রাজির বেশী বেশী আলোচনা হওয়া আবশ্যক	১৭
৮।	আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের আরও একটি মহামহিম দিক	১৮
৯।	আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা এবং তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা	১৮
১০।	আশার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছা	২০
১১।	আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিপূর্ণ ভালবাসা	২২
১২।	ঐশী প্রেমের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ শিক্ষা	২৩
১৩।	আঁ হযরত (সঃ)-এর ঐশী ভালবাসার সর্বোচ্চ মার্গ	২৪
১৪।	পরিপূর্ণ উৎসর্গ ও উহার পরিণাম	২৬
১৫।	আগামী শতাব্দীতে সম্বর্ধনা দেবার প্রসঙ্গে একটি খুবই কল্যাণমন্ডিত আন্দোলনের ঘোষণা	২৭
১৬।	জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ উৎসর্গকারী আসা উচিত।	২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আগামী শতাব্দীকে সত্যিকারভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের যোগ্যতা সৃষ্টিকারী এক কল্যাণমণ্ডিত ঘোষণা ঃ

আগামী দু'বছরে জন্মগত শিশুদেরকে খোদা ও তাঁর ধর্মের সেবায় এখন থেকেই উৎসর্গ করুন যেন উৎসর্গকৃত শিশুদের এক মহান বাহিনী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খোদার দাসে পরিণত হয়ে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করে। ইহা একটি উপহার যা কিনা আমাদেরকে আগামী শতাব্দীতে খোদার সন্নিধানে উপস্থাপন করতে হবে। জামাতের প্রত্যেক শ্রেণীকে এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সারা বিশ্বে বিনা ব্যতিক্রমে জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গকারী আসা উচিত।

আগামী শতাব্দীতে সত্য-ধর্ম বিপুলভাবে সবস্থানে ছড়ানোর জন্যে লক্ষ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উৎসর্গকারীগণের প্রয়োজন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

অর্থ ঃ তুমি বল, তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করেছো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়। ... (সূরাতুত্তাওবা ঃ ২)

এর পরে বলেন -

গত জুমুআয় আমি কুরআন করীমের আরও একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম।

কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাতাবি'উনী ইউহ্বিব্কুমুল্লাহ্

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! ইহা ঘোষণা করে দাও যে, যদি তুমি সত্য সত্যই নিশ্চিৎভাবে আল্লাহ্র সাথে ভালবাসা রাখো অথবা প্রকৃতই খোদার সাথে ভালবাসা করতে চাও **ফাত্তাবি'উনী ইউহ্বিব্কুমুল্লাহ্**- তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। নিশ্চয় খোদা তোমাদের ভালবাসতে থাকবেন।

এ বিষয়ের কতিপয় দিক আমি গত খুতবায় বর্ণনা করেছিলাম, কিছু আজ বর্ণনা করবো। কিন্তু এর পূর্বে আমি বলতে চাই যে, এখন আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তার দ্বিতীয় আয়াতটির অনুসরণে যখন আল্লাহ্তাআলার ভালবাসার দাবীর ফলে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াস সাল্লামের অনুসরণ ও আনুগত্যের আদেশ পাওয়া গেছে তখন প্রশ্ন এই যে, এর মধ্যে যুক্তিগত গ্রন্থি কী আছে, আর এ আনুগত্য কীভাবে হতে পারে ? কী রঙ্গে আনুগত্যের প্রতি তাগিদ করা হয়েছে ? একজন মানুষ কোন এক দেশে আইনের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে থাকে এবং কখনও নিজের প্রশিক্ষকের আনুগত্যও করে থাকে, তিনি যে কোন বিষয়ের ওপরে প্রশিক্ষণ দেন না কেন, উহা তারা অনুসরণ করে থাকে। এ

যেহেতু এ আদেশের মধ্যে খোদাতাআলা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা রেখেছেন, এ আদেশের মধ্যে কোন যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা হতে পারে না। এজন্যে আমাদের তো একথা পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে যেতে হবে যে, খোদাতাআলা তাঁর আদেশের ফলশ্রুতিতে ভালবাসা প্রত্যাশা করেন। যদি আপনার কারও সাথে ভালবাসা থাকে তাহলে তার প্রত্যুত্তরে সে-ও ভালবাসার প্রকাশ দেখায়। আর এখন একটি জিনিসের প্রতি বা এমন এক সত্তার প্রত্যুত্তর হিসেবে ইঙ্গিত করে যে, যদি আমার সাথে তোমার ভালবাসা থাকে তাহলে স্মরণ রাখো, তোমাদের বলছি, আমি নিজের ভালবাসার একটি বাহ্যিক প্রতিবিম্ব মানুষের মধ্যেও রেখেছি। যেভাবে তোমরা বিশ্ব-জগতকে প্রত্যক্ষ করছো আর এর চারদিকে সৌন্দর্য দেখছো এবং এর দিকে আকর্ষিত হতে থাকো, সেভাবে তোমাদের এমন এক প্রিয় সত্তা হিসেবে বলছি যে, যে আমার প্রেমের কারণে সুসজ্জিত, আমার ভালবাসার ফলশ্রুতিতে যার মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, তোমরা তাকে দেখো আর তার ওপরে আকৃষ্ট হয়ে যাও আর প্রেমিকের দৃষ্টিতে তার আনুগত্য করো। এ বিষয়-বস্তুই এ আয়াতের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে এবং অন্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।

অতএব খোদার পক্ষ থেকে যেন জবাব এই যে, আমার জন্যে তোমাদের ভালবাসা তো আছে বা আকাঙ্ক্ষা আছে অথবা সদিচ্ছা আছে যে, সত্যিকারের ও প্রকৃত ভালবাসা দেখাও। কিন্তু কোন এক সত্যিকারের প্রেমিক, তোমাদের জানা নেই যার সাথে আমি প্রেম করেছি। এজন্যে যার সাথে আমি ভালবাসা স্থাপন করেছি যদি তোমরা তার পিছনে অনুগমন করো তাহলে আবশ্যিকভাবে ও অকাট্যভাবে আমি তোমাদের সাথেও প্রেম করতে থাকবো আর খোদা যার সাথে প্রেম করেন সে অবশ্যই সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে। কেননা, ঘৃণ্য সত্তার সাথে খোদা প্রেম করেন না। যে ব্যক্তির প্রসঙ্গে আল্লাহ্ একথা বলেন যে, আমি তাকে ভালবেসেছি, তার মধ্যে ইহা নিহিত যে, ঐ ব্যক্তি অবশ্যই সৌন্দর্যমণ্ডিত। এতদ্ব্যতিরেকে কোন কিছু হতেই পারে না। এজন্য অবশ্যই তার মধ্যে গোপনীয় ও সুপ্তভাবে বাণীর আকারে আপনারা ইহা দেখতে পারেন (নচেৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা হতে পারে না) যে, তোমরা ভালবাসার দাবীদার এবং ভালবাসার প্রত্যাশী তাই আমি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সংবাদ দিচ্ছি, যে আমার সাথে ভালবাসার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সে-ও স্বয়ং খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত ছিলো। কিন্তু আমার ভালবাসার ফলশ্রুতিতে তার সৌন্দর্যে আরও চমক সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, আমি তাকে খুবই ভালবাসি। সুতরাং তোমরা ঐ পথে অনুগমন করো, যে-পথে সে পদচারণা করেছে। তাহলে পরে তোমাদের মধ্যেও ঐ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ করবে আর আমি তোমাদের সৌন্দর্যকে ভালবাসতে আরম্ভ করবো।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা না থাকার নাম দুষ্কৃতি ঃ

এই আয়াতের মধ্যে ঐ পরিপূর্ণ জবাব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এর সমর্থন করছে। এর মধ্যে একটি আয়াত এখন আমি তিলাওয়াত করেছি এর মধ্যে এই বিষয়-বস্তু খুবই বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল্লাহ্তাআলা) বলেন ঃ **কুল ইন কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আযওয়াজুকুম ওয়া আশিরাতুকুম ওয়া আমওয়ালুনিক্তারাফতুমূহা ওয়া তিজারাতুন তাখশাওনা কাসাদাহা ওয়া মাসাকিনু তারযাওনাহা আহাব্বা ইলায়কুম্মিনাল্লাহি ওয়া রসূলিহী ওয়া জিহাদিন ফী সাবীলিহী ফাতারাব্বাসু হাত্তা ইয়াতিআল্লাহু বিআমরিহী ওয়াল্লাহু লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন** (সূরাতু ত্তাওবা ঃ ২৪)।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! ইহাও ঘোষণা করে দাও যে, যদি তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের গোষ্ঠী ও জাতি ঐ সম্পদ যা কিনা তোমরা আয় করো এবং পরিশ্রম করে লাভ করে থাকো আর এসব ব্যবসায়-বাণিজ্য যার সম্বন্ধে তোমরা ক্ষতির আশঙ্কা করে থাকো যে, কখন না জানি লোকসান হয়ে যায় এবং ঐ বসবাস করার গৃহ যাতে তোমরা সন্তুষ্ট অর্থাৎ ঐ অট্টালিকা ও আবাসগৃহ যা তোমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে– **আহাব্বা ইলায়কুম্মিনাল্লাহি ওয়া রসূলিহী**– তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অধিক প্রিয় হয় এবং খোদার পথে জিহাদ ও সংগ্রাম করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়– **ফাতারাব্বাসূ হাত্তা ইয়াতিয়াল্লাহু বি আমরিহী**– পরে তোমরা অপেক্ষা করো এমনকি যে, খোদা তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ এমন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে দেন যদ্বারা তোমাদের ভালবাসা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং খোদাতাআলার ভালবাসা লাভের পরিবর্তে তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হও। (আল্লাহ্) বলেন ঃ **ওয়াল্লাহু লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন**– খোদাতাআলা দৃষ্কৃতকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। কুরআন করীম ফিস্ক-এর পরিচয় দিয়েছে এবং ফিস্ক এর পরিচয় আপনারা পৃথিবীর কোন পুস্তকে পাবেন না। ফিস্ক দ্বারা তো আমরা সাধারণতঃ ইহা মনে করতাম যে, পাপ করা বা নির্লজ্জভাবে অপসন্দনীয় অঙ্গ-ভঙ্গী করা। কিন্তু কুরআন করীম ফিস্ককে ভালবাসার বিষয়-বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট করে ভালবাসা-শূন্যতাকে ফিস্ক নির্ধারণ করেছে। বলেছেন– খোদার পরে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা অবশ্য কর্তব্য। যদি তোমরা এ সত্তার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক না রাখো তাহলে তোমরা ফাসেক বা দৃষ্কৃতকারী। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ভালবাসা না রাখার সাথে ফিস্ক-এর কী সম্পর্ক ? এ প্রসঙ্গে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বর্ণনা করেছেন। তিনি (আঃ) বলেন, আঁ হযরত

সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতিটি মুহূর্ত খোদাতআলার আনুগত্যে নিয়োজিত ছিলো। সামান্যতম দুর্বলতা এর মধ্যে ছিলো না। যদি কোন দুর্বলতা বা কমতি এর মধ্যে থাকতো তাহলে খোদাতাআলা আমাদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার আদেশ দিতেন না। যখন খোদা পরিপূর্ণ আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন তখন জানা গেল যে, তাঁর (সঃ) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খোদাতাআলার সন্তুষ্টির অধীন ছিলো। আর যে কর্ম খোদাতাআলার সন্তুষ্টির বাইরে উহাই ফিস্ক। সুতরাং কুরআন করীমে ফিস্ক-এর পরিচয় ভালবাসার বিষয়-বস্তুর সাথে জড়িয়ে বর্ণনা করেছে। কিন্তু ইহা বিস্ময়কর। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগ্রামী জীবনের সাথে যদি তোমাদের ভালবাসা না থাকে অর্থাৎ রসূলে আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সারা জীবন ব্যাপী যে জিহাদ করে দেখিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে যদি উহার কদর ও মর্যাদা না থাকে তাহলে তোমাদের অবস্থা ফাসেকদের অবস্থার অনুরূপ আর যেখানে তোমরা এ সুন্নত থেকে স্খলিত হবে সেখানে তোমরা ফিস্কের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্তাআলা ফাসেক ও দুষ্কৃতকারীদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না।

জিহাদের সাথে ভালবাসার আসল তাৎপর্য ঃ

এখানে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ও সংগ্রাম করার প্রতি অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বাহ্যিকভাবে মানুষ ইহা চিন্তা করতে পারে না যে, জিহাদের সাথেও কি ভালবাসা হতে পারে ? **এখানে তলোয়ারের জিহাদের কথা বলা হয় নি। ভালবাসার পরিণতি হিসেবে প্রেমাস্পদকে লাভ করার জন্যে সব রকমের চেষ্টা-প্রচেষ্টার নাম কুরআন করীমে জিহাদ রাখা হয়েছে।** সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার পর আল্লাহ্তাআলার পথে জিহাদ করার উল্লেখ করে এ সম্পর্কে এই বিষয়-বস্তু প্রকাশ করা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন ঐ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদে নিয়োজিত ছিলো। প্রত্যেক সময়ে তো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তলোয়ার হাতে নিয়ে চলাফেরা করেন নি। তাঁর (সঃ) হাতে তো সর্বদা কামান-বন্দুক থাকতো না। অসাধারণ যুদ্ধসমূহে যখন তিনি যোগদান করতেন তখন কার্যতঃ শত্রুর ওপরে প্রভাব খাটানোর সুযোগ তাঁর লাভ হতো। কিন্তু তাঁর জিহাদ ঐ সময়েও ছিলো যখন তের বছরের মক্কী জীবনে অসীম যুলুম-নির্যাতনের অবস্থায় জীবন কাটাতেন তিনি। অতএব **জিহাদ কেবল মারধর করার নাম নয় বরং এথেকে অধিক মার খাওয়ার নাম আর খোদার পথে দিনরাত তাঁর ভালবাসায় মগ্ন থেকে জীবিত থাকার নাম।** এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যদি তোমাদের এসব জিনিসের প্রতি ভালবাসা না থাকে তাহলে পরে খোদাতাআলার সাথে তোমাদের

ভালবাসার দাবী করা কেবল মিথ্যাই নয় বরং খোদাতাআলার দৃষ্টিতে দৃষ্কৃতকারী জীবন।

ভালবাসার উৎকৃষ্ট চিহ্ন ঃ

এখন এখানে এসেও এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আদেশ তো খুব কঠিন প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু ভালবাসা জোর করে কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে ? যেভাবে আমি প্রথমেও প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম, ভালবাসা আর শক্তি প্রয়োগ আপসে যুক্ত হতে পারে না। কোন ব্যক্তি আপনার যতই প্রিয় হোক না কেন তাকে আপনি বলুন যে, তুমি অমুক জিনিষকে ভালবাসতে থাকো, তাহলে সে মনে করবে যে, তার কি হয়েছে, তার মাথায় কি কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে ? পার্থিব লোকেরা তো সম্ভবতঃ এতটা পর্যন্ত বলে ঃ

আমি তোমাকে ভালবাসি, এজন্যে তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের সকলকে কি ভালবাসতে হবে ?

আমার মন আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমার দ্বারা ঝগড়া হতে পারে না। আশ্চর্য শর্ত লাগাচ্ছো ! তোমাকে ভালবাসি বলে সাথে সাথে তাদের সঙ্গেও ভালবাসা সৃষ্টি করতে নিয়োজিত হও যারা তোমাদের ভালবাসার প্রত্যাশী। আমার অন্তর ফিরিয়ে দাও। আমাকে আমার অন্তর ফিরিয়ে দাও। এ ঝগড়া আমার সাথে হতে পারে না।

অতএব আল্লাহ্তাআলার মাহাত্ম্য দেখুন যে, এখানে বলছেন, আমাকে ভালবাস তো আমার প্রেমিকগণকে ভালবাসো। আর যদি আমার প্রেমিকগণকে না ভালবাসা তাহলে তোমরা ফাসেক ও দুষ্কৃতকারীতে পরিণত হবে। তাহলে তোমাদের ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত। ইহা হলো আসল প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা। প্রকৃতকথা এই যে, ভালবাসার উৎকৃষ্ট চিহ্ন ও উহার সত্যতার প্রমাণ এই যে, **যাকে প্রভু আদর করেন তাকে আদর করা হোক। আর যে নিজ প্রেমাস্পদকে আদর করে তার সাথে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, না তার সাথে শত্রুতা বৃদ্ধি পায় ?** সুতরাং কুরআন করীমে এ বিষয়-বস্তু অন্য একস্থানেও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে খোদা ! আমাদের অন্তরে এসব মু'মিনের জন্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না যারা ঈমানে আমাদের চেয়ে আগে বেড়ে গিয়েছে। পরে আমরা তোমার নিকট কাতর অনুনয়-বিনয় করছি যে, কোন ভিত্তিতে কোন ভুল-ত্রুটির কারণেও তাদের ব্যাপারে আমাদের হৃদয়ে কোন শত্রুতা সৃষ্টি করো না।

এ আয়াতের মধ্যে শিয়াদের ভ্রমাত্মক দর্শনের সর্বকালীন জবাব রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কতক আমাদেরকে আজ এমন সব কথা বলে, যার ফলে ঈমানে অগ্রগামীদের ওপরে ঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে। আর কুরআন করীম

আমাদেরকে এ দোয়া শিখিয়েছে যে, ঐসব লোক যারা আগে চলে গেছেন তারা প্রথম মার্গের ঈমান আনয়নকারী ছিলেন। হে খোদা ! তাদের প্রতি আমরা যেন ঘৃণা পোষণ না করি। ভুল ধারণার কারণে, ইতিহাস ভুল বুঝার ফলশ্রুতিতে বা ত্রুটিপূর্ণ রেওয়ায়াত পৌছার ফলশ্রুতিতেও হতে পারে, আমাদের হৃদয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাদের জন্যে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে আল্লাহ্ ! তাদের ব্যাপারে আমাদের হৃদয়কে কোমল রাখো-এর কারণ কি ? এর কারণ এই যে, তারা খোদার প্রেমিক ছিলেন। আর বিষয় উহাই যে, **আমার প্রেমিক হতে চাও তো আমার প্রেমিকদেরকে ভালবাসো। ইহা ব্যতিরেকে ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে না।** ইহাই উহার দর্শন। যদি খোদার সাথে প্রেমের ফলশ্রুতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হতো আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি থাকতো তাহলে খোদার যত প্রেমিক থাকতো তত সংখ্যায়ই খোদার খোদাইর ধ্যান-ধারণা বিভক্ত হয়ে যেতো। একই উম্মত সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকতো না। খোদার প্রত্যেক প্রেমকারী খোদার সাথে অন্যান্য প্রেমকারীর সাথে হিংসার অনলে পুড়তো, হিংসা করতে থাকতো, ঘৃণা করতে থাকতো এই বলে যে, সে কে যে ঐ খোদার সাথে প্রেম করে যার সাথে আমি প্রেম করে থাকি ?

রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুপম সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণ শিক্ষা ঃ

এই মুর্খতার প্রেম তো কেবল খোদা পৃথিবীর (সাধারণ মানুষের) জন্যে রেখে দিয়েছেন। নিজের জন্যে ঐ প্রেমকে পসন্দ করেছেন যা পরম তৌহীদ ও একত্ববাদ সৃষ্টি করতে থাকে। আর এই একত্ববাদের সীমা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ এই যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি অনুরাগের শিক্ষা আল্লাহ্তাআলা এমন রঙ্গে দিয়েছেন, খুবই ব্যাপকতার সাথে দিয়েছেন ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রজ্ঞার সাথে। কুরআন করীমে অনুরাগ ও প্রেমের শিক্ষা রয়েছে যে, আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন পৃথিবীর আর কোন ধর্মে আপনি এর মত সুন্দর, এত পরিপূর্ণ, এত সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা দেখতে পাবেন না। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হলো প্রথম কথা। কোন আদেশ বা বল প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে নয়। এজন্যে যে, তিনি ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য সত্তা। আর খোদাতাআলা নিদর্শনের মাধ্যমেই বলে দিয়েছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এথেকে অধিক আর তোমাদের কোন্ দলীল প্রয়োজন যে, আমি তাকে ভালবাসি। যদি মানুষ অধিক সুন্দর হয় তাহলে তুলনামূলকভাবে কম সুন্দরের সাথে ভালবাসা স্থাপনের সম্ভাবনা কম। কোন ব্যক্তি যত সুন্দর তার চেয়ে কম সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এ ব্যক্তির কম, কিন্তু তার চেয়ে অধিকতর সুন্দর হলে তার প্রতি ভালবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্যের সবচে' বড় প্রমাণ এ আয়াতে নিহিত রাখা হয়েছে যে, তিনি এতই সুন্দর যে, আমি তাকে ভালবেসে থাকি।

আর এতই ভালবাসি যে, যদি তার আনুগত্য করো তাহলে আমি তোমাদেরও ভালবাসতে আরম্ভ করবো।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহরাজির বেশী বেশী আলোচনা হওয়া আবশ্যক ঃ

সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তায় সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। আর এই যে সৌন্দর্য উহার বিবরণ প্রচারিত হওয়া উচিত। এর উল্লেখ প্রবহমান থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে সভা-বৈঠক করা উচিত। বড় ছোট সবার এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন,

"হে মন ! না দেখে কীভাবে কোন চন্দ্রমুখীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারো ? কীভাবে কোন কল্পিত প্রেমাস্পদের প্রতি অন্তর নিবদ্ধ করা যায়" ?

সুতরাং কুরআন করীম যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার আদেশ দিয়েছে, যখন কুরআন করীম অনুগ্রহ করে আমাদের জন্যে ইহা বলেছে যে, অনেক প্রেমাস্পদই মজুদ আছে তাদেরকে ভালবাসলে তোমাদের হৃদয়ে খোদার ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং খোদা তোমাদেরকে ভালবাসতে লেগে যাবেন। তাই কেবল ইহা বলাই যথেষ্ট নয় যে, হে মন ! না দেখে কীভাবে কোন চন্দ্রমুখীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারো ? আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে উপস্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

এজন্যে আমি গত বছর নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যতই আমরা ইসলামের বিজয়ের শতাব্দীতে প্রবেশ করার নিকটবর্তী হতে যাচ্ছি রসূলে করীম (সঃ)-এর জীবন-চরিতের ওপরে বেশী বেশী আলোচনা সভা হওয়া প্রয়োজন যেন ঐ শতাব্দীতে আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর প্রেমাস্পদের একটি দল প্রবেশ করে। কেবল ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে বড় বড় ধ্বনি উচ্চারণকারী শূন্য হৃদয়ের লোক না হয়, বরং এমন লোক হয় যাদের অন্তর ঐশী-প্রেম ও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রেমে ভরপুর থাকে। যাদের রক্তে এই প্রেম ও ভালবাসা প্রবহমান রয়েছে এবং পথের এ সম্বল ব্যতিরেকে আপনারা আপনাদের আগামী শতাব্দীর প্রজন্মের জীবনে কোন মহা পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারবেন না।

বিরাট বড় শতাব্দী আমাদের জন্যে অপেক্ষমান। এতে অনেক বড় বড় কাজ সাধিত হবে। আমাদের নিকট থেকে তাদের ধরন শিক্ষা করা আবশ্যক আর ঐ রং ধারণ করে আগামী শতাব্দীর দিকে সম্মুখে এগুতে হবে। অতএব ঐ সময় আমরা যে শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, ইহা আসার পূর্বেই আমাদের উচিত যে, আমরা ঐ পরম সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ করে দিই যা কিনা আল্লাহ্ ও রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভালবাসার ফলশ্রুতিতে প্রকাশিত হয়- উহার ফলশ্রুতিতে লাভ হয়ে থাকে।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের আরও একটি মহামহিম দিক ঃ

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের জন্যে আর একটি দিক এই যে, খোদাতাআলা স্বয়ং হুযূর আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নিজের আনুগত্য করা শিখিয়েছেন, যেভাবে কুরআন করীমে বলা হয়েছে যে, **ইত্তাবি' মা উহিয়া ইলায়কা মির্‌রব্বিকা লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়া আ'রিয আনিল মুশরিকীন** (সূরাতুল আন'আম ঃ ১০৭ আয়াত) অর্থাৎ যা কিছু তোমার ওপরে ওহীর আকারে অবতীর্ণ করা হচ্ছে উহার আনুগত্য করতে থাকো এবং অংশীবাদীদেরকে এড়িয়ে চলো, আর কারও প্রতি চোখ তুলে দেখো না। অতএব রসূলে আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যে অন্য কারও অংশ নেই। অর্থাৎ এতে তিনি অদ্বিতীয়। কেউ ইহা না বুঝে যে, খোদা বলছেন যে, আমাকে ভালবাসো তো অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তিকেও ভালবাসতে আরম্ভ করে দাও। এমন এক ব্যক্তিকে ভালবাসার আদেশ দেয়া যচ্ছে যাকে খোদাতাআলা স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বীয় রং তার ওপরে ছিটিয়ে দিয়েছেন। এবং স্বীয় সৌন্দর্যকে অধিকতর আমাদের সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। যতটা মানুষের সাথে সম্পর্ক, মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন যার ফলশ্রুতিতে একে অন্যকে ভালবাসে। সুতরাং এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার খানা কা'বাতে প্রবেশ করেন। সেখানে কিছু লোক মূর্তিকে সাজাতে ছিলো। ওগুলোকে দাঁড় করিয়ে দুল পরিধান করাচ্ছিলো, পোষাক পরাচ্ছিলো, আবার তারা নিজেরাই ওগুলোকে সাজিয়ে সিজদা করছিলো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ কী করছো ? তারা বল্লো, আমরা তাদেরকে ভালবাসি এজন্যে এদের পূজো করছি। কেননা, এরা আমাদের খোদাকে ভালবাসতে শেখায়। তাদের ভালবাসার মাধ্যমে আমাদের আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ হয়। ঐদিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ **ক্বুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন্নাল্লাহা ফাত্তাবি'উনী ইউহ্‌বিকুমুল্লাহ্‌**-কতইনা বোকামী যে, তোমরা কীভাবে মূর্তিদের নিকট থেকে খোদার ভালবাসা শিখছো। ওরা তো আনুগত্য করার যোগ্যতাই রাখে না। আর না ওগুলোর আনুগত্য করা যেতে পারে। খোদার ভালবাসা তো তার নিকট থেকে শেখা যায় যাকে খোদাতাআলা স্বয়ং তাঁর ভালবাসা শিখিয়েছেন। যেহেতু আমাকে খোদা নিজের ভালবাসা শিখিয়েছেন এজন্যে তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি ইহা তোমাদের দাবী হয়ে থাকে তাহলে পরে মূর্তিদের আনুগত্যে খোদার ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারে না।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা এবং তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা ঃ

আরও এক প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার চিত্র এই ভাষায় এঁকেছেন বা আনুগত্যের চিত্র এসব শব্দে এঁকেছেন–**কুল ইয়্যাইবাদীয়াল্লাযীনা আসরাফু 'আলা আনফুসিহিম**– বলে দাও, "হে আমার দাসগণ !" এখানে শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, হে আমার দাসগণ! মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে যে, ঘোষণা করে দাও, মানব সন্তানদেরকে বলে দাও, হে আমার দাসগণ ! কতক তফসীরকারক খুবই সঙ্কটে ও জটিলতায় পড়েছেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তো পরিপূর্ণ একত্ববাদের বাণী নিয়ে এসেছেন। খোদাতাআলা তাঁকে শিখাচ্ছেন যে, বলো, হে আমার দাসগণ ! আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এ বিষয়ে একাধিকবার লিখেছেন এবং প্রত্যেক বারেই অতীব সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন।

একবার তিনি বলেছেন যে, এখানে 'ইবাদী' বা দাসগণ বলতে ভৃত্য বুঝাচ্ছে, সৃষ্টি বুঝায় নি। সুতরাং **কুল ইয়্যা ইবাদীয়াল্লাযীনা আসরাফূ 'আলা আনফুসিহিম**-এর অর্থ হলো, হে মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)! ইহা ঘোষণা করে দাও যে, হে আমার ভৃত্যগণ ! চিত্রের ভাষায় আমাদেরকে আনুগত্যের বিষয়-বস্তু শিখানো হচ্ছে। এখানে যখন খোদাতাআলা বলেন, আনুগত্যের ঘোষণা দাও, তখন এর উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, আমার ভৃত্যসুলভ প্রেমিকে পরিণত হয়ে যাও যেভাবে ভৃত্য প্রভুর আনুগত্য করে আর ঐ আনুগত্যে চুল পরিমাণ অবাধ্যতা করার শক্তি দেখা যায় না সেভাবে। **মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে এমন পরিপূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টি করো যেন তোমাদের মধ্যে অমান্য করার শক্তিই না থাকে যেন সানন্দে তোমাদের সমগ্র শক্তি পরিপূর্ণভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে ন্যস্ত করা হয়।** কেন করা হয় ? উহার দলীল-প্রমাণ আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমের অন্য স্থানে দিচ্ছেন। কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন– **কুল ইন্না সলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন**- আমি তোমাদেরকে বলছি যে, আমার ভৃত্যে পরিণত হও। সব কিছু আমার ওপরে ন্যস্ত করো এবং প্রেমিকের রঙ্গে আমার আনুগত্য করা আরম্ভ করো, এজন্যে নয় যে, আমার সত্তায় কিছু রেখে দেয়া হয়েছে। আমি তো আমার সব কিছু লেঠা চুকিয়ে ফেলেছি। আমি আমার বলতে কিছুই অবশিষ্ট রাখি নি। খোদা ইহাও ঘোষণা করাচ্ছেন– **কুল ইন্না সলাতী ওয়া নুসুকী**– আমার সকল ইবাদত এবং উহার এক একটি দিক, সকল রোযা এবং কুরবানীগুলো এবং উহার প্রত্যেক দিক, আমার মরণ ও আমার জীবিত হওয়া সব খোদার জন্যে উৎসর্গীকৃত।

অতএব যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে খোদাতাআলা ইহা বলেন যে, তার নিকট সোপর্দ হয়ে যাও তখন এজন্যে নয় যে,

একজন মানুষকে অন্য একজন মানুষের নিকট সোপর্দ করার আদেশ দেয়া যাচ্ছে, বরং এজন্যে যে, একজন মানুষকে এমন এক সত্তার নিকট সোপর্দ করার আদেশ দেয়া হচ্ছে, যিনি নিজের মানবীয় সত্তাকে বিলীন করে দিয়ে সর্বৈব নিজেকে নিজে খোদাতাআলার নিকট সোপর্দ ও ন্যস্ত করেছেন। যদি ইহা সম্পন্ন হয় তাহলে সমস্ত কল্যাণরাশির অর্গল উন্মুক্ত হয়ে যায়। অথচ এখানে কল্যাণরাশির উল্লেখ করা হয় নি। এখানে অন্য একটি দিক বর্ণনা করা হচ্ছে, বলা হয়েছে, **আল্লাযীনা আসরাফূ 'আলা আনফুসিহিম লা তাক্বনাতুমির রহমাতিল্লাহ্**– ঐ সকল লোক যারা বড় বড় পাপ করেছে, পাহাড় সমান পাপই করে থাকুক না কেন, তাদের জন্যেও কোন ভয় নেই। যদি তারা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিছু না ছাড়ে এবং ভৃত্যদের ন্যায় পিছনে ফিরতে থাকে তাহলে তাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কেননা খোদাতাআলা সকল পাপ ক্ষমা করার শক্তি ও সামর্থ্য রাখেন, তবে শর্ত এই যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের (আনুগত্যের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। যেহেতু এই যে ত্রিত্ববাদের সমস্যা এবং আমাদের খাতিরে একজন ত্রাণকর্তা নিজেকে নিজে নাউযুবিল্লাহ্ (এথেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি আমরা) অভিশপ্ত করেছে– এই যে, চিন্তাধারা উপস্থাপন করা হয়েছে এসবকে বাতিল ও রহিত করে দিয়ে এ আয়াতে বলা হয়েছে, ঐ সত্তা যিনি খোদার নিকট সোপর্দ হয়ে গেছেন, সর্বৈব তাঁর হয়ে গেছেন, যদি তোমরা তাঁর পিছে চলতে আকাঙ্ক্ষা করো তাহলে এ ভয়ে ভীত হয়ো না যে, আমরা পাপী আমরা কীভাবে অনুসরণ করবো, আমরা কারা যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবো-এ ধারণা মনে সৃষ্টি হতে পারে ? (আল্লাহ্‌তাআলা) বলেন, না, যদি এ সত্তার আনুগত্য করো তবে তোমরা দেখতে পাবে যে, **ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুযযুনূবা জামী'আন**- মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত ও রীতি এবং তাঁর জীবনের ধরনকে খোদাতাআলা এতই ভালবাসেন যে, তাঁর (সঃ) খাতিরে এ সুন্দর ভঙ্গীমা-র খাতিরে যা কিনা তোমরা অবলম্বন করবে তা লাভ হবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্বে। আল্লাহ্‌তাআলা, তোমাদের সর্বপ্রকার পাপ ক্ষমা করতে থাকবেন– **ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহীম** নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল ও বারবার কৃপাকারী (সূরাতুল যুমার ঃ ৫৪ আয়াত)।

আশার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছা ঃ

পুনরায় আরও একটি স্থানে নেতিবাচক দিক থেকে যে ভীতি ছিলো তা দূর করে ইতিবাচক দিক থেকে আশার শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। (আল্লাহ্ বলেছেন) ঃ

ওয়া মাইইউত্বিইল্লাহা ওয়ার্ রসূলা ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলায় হিম মিনান্নাবীয়্যিনা ওয়াসসিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদাই

ওয়াস্‌সলিহীনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রফীক্বা (সূরাতুন্ নিসা ঃ ৭০) অর্থাৎ যখন ভালবাসার ফলশ্রুতিতে আর প্রেমের কারণে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের আদেশ দেয়া হয়, তখন বলা হয়, এর পরে যখন আমি বলি যে, তোমরা আমার প্রিয় হয়ে যাও তখন এভাবে প্রিয় পাত্র বানিয়ে আমি তোমাদেরকে কি দিবো ? কোন প্রতিশ্রুতির আকারে তো ব্যাখ্যাও হওয়া দরকার যে, প্রিয় পাত্রের সাথে খোদা কী ব্যবহার করে থাকেন। (আল্লাহ্) বলেন, যদি তোমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করো এজন্যে যে, তিনি খোদার আনুগত্যকারী– **মাইইউত্বিইল্লাহা ওয়ার্ রসূলা**-এর মধ্যে একই বন্ধনীতে বেঁধে দেয়া হয়েছে। একজনের আনুগত্য অন্যজনের আনুগত্য থেকে পৃথক হতে পারে না-এ বিষয়-বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। (আল্লাহ্) বলছেন– **ওয়া মাইত্বিইউল্লাহ্ ওয়ার্ রসূলা ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলায়হিম**-তোমরা দেখবে যে, তোমাদের খোদার পুরস্কারসমূহের বৃষ্টিধারা বর্ষিত হচ্ছে আর তোমরা দেখবে যে, কোন পুরস্কারই এমন নয় যা ঐ আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে না পেতে পারো। (আল্লাহ্) বলেছেন, **মিনান্নাবীয়িনা ওয়াস্ সিদ্দিক্বিনা**– পাহাড়ের মত মহান উচ্চ পুরস্কার নবীদের পুরস্কার। (আল্লাহ্) বলেছেন, তোমাদের আনুগত্যের স্তর ইহা অতিক্রম করবে যে, তোমরা এ আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে খোদার খুবই প্রিয় দাসে পরিণত হয়ে যাবে। যদি সালেহ ও নিষ্ঠাবান বান্দায় পরিণত হয়ে যাও তাহলে ঐ পুরস্কারেও খোদা বাধা প্রদান করবেন না এবং যদি সামনে অগ্রসর হয়ে শহীদের মার্গ পর্যন্ত পৌঁছে যাও তাহলে তোমাদের মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্বের মাধ্যমে শহীদের মার্গের সৌভাগ্য লাভ হবে। যদি এর চেয়ে সম্মুখে পদ-বিক্ষেপ রাখার সাহস থাকে এবং সিদ্দিকীয়তের মর্যাদা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারো তাহলে ইহা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্বে সিদ্দিকীয়তের মার্গ পর্যন্ত পৌঁছুবে। আর এ পুরস্কারও তোমাদের ওপরে অবতীর্ণ হবে এবং এর চেয়েও সম্মুখে যদি অগ্রসর হওয়ার শক্তি থাকে আর স্বীয় পরিপূর্ণ সত্তা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে বিলীন করে দেয়ার মহান সৌভাগ্য লাভ হয় তাহলে পরে দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে যিল্লী বা প্রতিচ্ছায়ামূলক নবুওয়তও প্রদান করা হবে যা কিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্বের ফলশ্রুতিতে লাভ হতে পারে। এ ভালবাসা অসীম পুরস্কারসমূহের অর্গলগুলোকে উন্মোচন করতে থাকে। এ ভালবাসা ঐ ভালবাসারই সূচনা। এই দাবী এ আকাঙ্ক্ষা ও এ অঙ্গীকার থেকে উৎপন্ন যে, আমরা খোদাতাআলাকে ভালবাসি। সব কিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং

এর সব দিক বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়-বস্তু এমনই যেভাবে বলা হয়েছিলো–কুরআন করীমের পরিবেষ্টনকারী। কুরআন করীম সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এ বিষয়ের সকল দিকে আলোকপাত করা কয়েকটি খুতবায়ও সম্ভব নয় কেবল এক দু'টি বিষয় এসব খুতবায় বর্ণনা করার জন্যে বেছে নিয়েছি।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিপূর্ণ ভালবাসা ঃ

পরিশেষে আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার স্বীকারোক্তি আপনাদের সম্মুখে রাখছি। এমন এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি যিনি তাঁকে ভালবাসার বন্ধনে সোর্পদ করেছেন এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেমাস্পদ হিসেবে লাভ করেছেন। **তাঁর হৃদয়ে হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে ভালবাসার এমন ঢেউ খেলতো যে, উহার কোন দৃষ্টান্ত আপনারা আর কোথাও দেখতে পাবেন না– পৃথিবীর প্রেমিকদের মধ্যেও নয় আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে আধ্যাত্মিক প্রেমিকদের মধ্যেও আপনারা এ দৃশ্য দেখবেন না।**

কোন এক ঘটনায় তিনি (আঃ) বলেন ঃ

আগার খওয়াহি দলীলেঁ আশেকশ বাশ।
মুহাম্মদ হাস্ত বুরহানে মুহাম্মদ ॥

অর্থাৎ যদি তোমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতার দলীলসমূহ চাও তাহলে একটিই দলীল যে, তোমরা তাঁর প্রেমিক হয়ে যাও। এখন এমন কোন ব্যক্তি যে এমন মহান তত্ত্ব যদি স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি না করে থাকেন তাহলে এ কথা তিনি বলতেই পারেন না। (তিনি-আঃ) বলেছেন, মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে লাভ করার এই তো সুন্দর রাস্তা। তোমরা তর্কশাস্ত্রের দলীলসমূহ কি অন্বেষণ করছো ? তিনি তো এক সুন্দর সত্তা। তাঁকে দেখো আর প্রেমিকে পরিণত হয়ে যাও– মুহাম্মদ হাস্ত বুরহানে মুহাম্মদ। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং স্বীয় সৌন্দর্যের প্রমাণ– এথেকে বেশী আর কোন দলীল দেয়া যেতে পারে না। আবার [তিনি (আঃ)] বলেছেন,

"আমি কেবল খোদার অনুগ্রহে, নিজের কোন কৌশলে ও পরিপূর্ণ কল্যাণের অংশ লাভ করি নি যা কিনা আমার পূর্বে নবী ও রসূলগণ এবং খোদার পুণ্যবান ব্যক্তিগণকে প্রদান করা হয়েছিল। আর আমার জন্যে এ কল্যাণ লাভ করা সম্ভবই ছিলো না যদি না আমি আমার নেতা ও প্রভু নবীদের গর্ব এবং সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথসমূহের আনুগত্য করতাম। সুতরাং আমি যা কিছু লাভ করেছি এ আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করেছি আর আমি আমার সত্য ও পূর্ণ

জ্ঞানে অবহিত আছি যে, আনুগত্য ব্যতিরেকে কোন মানুষ ঐ নবী (সঃ)-এর খোদা পর্যন্ত পৌছতে পারে না এবং পরিপূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞানের অংশ লাভ করতে পারে না। এবং আমি এখানে ইহাও বলে দিচ্ছি যে, উহা কি জিনিষ, যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকারের ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের পরে সকল কথার প্রথমে অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে" ?

আজ আমি এখানে ইহাও বলে চিচ্ছি যে, ইহাই হলো সকল কথার গোপন রহস্য, যার ওপরে এসে সব কিছুর ছন্দ পতন হয়। আমি ইতঃপূর্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে পাঠ করে শুনিয়েছিলাম। এতে এই বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্তাআলার আনুগত্যের শেষ চিহ্ন অন্তরে সৃষ্টি হয়, মস্তিষ্কের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর ঐ কথাই রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন ঃ

"সুতরাং আমি যা কিছু লাভ করেছি এই আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই লাভ করেছি। আর আমি নিজের প্রকৃত ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত আছি যে, কোন মানুষ নবী (সঃ)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে খোদা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না এবং পরিপূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞানের অংশ লাভ করতে পারে না। আর আমি এখানে একথাও বলে দিচ্ছি যে, উহা কি জিনিষ যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত ও পূর্ণ আনুগত্যের পরে সব কথার প্রথমে অন্তরে সৃষ্টি হয় ? সুতরাং স্মরণ থাকা দরকার যে, উহাই প্রশান্ত হৃদয়। অর্থাৎ অন্তর থেকে পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ মিটে যায় এবং অন্তর এক অনন্ত ও অবিনশ্বর স্বাদের প্রত্যাশী হয়ে যায়। আবার এর পরে এক স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী-প্রেম এ প্রশান্ত হৃদয়ের প্রসাদে লাভ হয়। আর এসব কল্যাণ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ হয়" (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ১২৭)। এ বিষয়ের যে কয়টি দিক আমি আজ বর্ণনা করতে চাচ্ছিলাম-একেতো সময় স্বল্প দ্বিতীয়তঃ এদের মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা করা আপাততঃ সম্ভব নয়- কিন্তু আমি গত জুমুআর খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম যে, আমি জামাতের সম্মুখে এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত একটি আন্দোলনের ঘোষণা করতে চাই।

ঐশী-প্রেমের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ শিক্ষা ঃ

প্রকৃত কথা এই যে, ভালবাসার ফলশ্রুতিতে মানুষ উপহার সামগ্রী উপস্থাপন করে থাকে। আর কুরআন করীমও এ রকম সব কিছুর সাথে যা কিনা খোদার পথে উপস্থাপন করা হয়, ভালবাসার শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এবং পুণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে ভালবাসার উপঢৌকন শর্তের আকারে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে। বলেছে - **লানতানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনাফিকু মিম্মাতুহিব্বুন**- তোমরা পুণ্যের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। পুণ্যের কথা বলছো ! তোমরা কি জানো যে, পুণ্য কী জিনিস ? তোমরা পুণ্যের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। যদি এ রহস্য না জানো

যে, খোদার রাস্তায় ঐ জিনিষ উপস্থাপন করো যার সাথে তোমার ভালবাসা রয়েছে। নিজের প্রিয় জিনিষগুলোকে খোদার পথে উৎসর্গ করা শিক্ষা করো। আবার তোমরা বলতে পারো যে, হ্যাঁ, আমরা পুণ্যের তাৎপর্য বুঝে নিয়েছি। এখানেও ভালবাসার বিষয়-বস্তু চলছে।

কখনও কখনও খৃষ্টানদের এই অভিযোগের ওপরে আমি বিস্মিত হই যে, ইসলাম ভালবাসার কী জানে ? ভালবাসা তো খৃষ্টবাদ শিখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ্‌র শিক্ষার কিছু উদ্ধৃতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম এখন ওগুলো পাঠ করে শুনাবার সময় নেই। আপনারা ওগুলো পাঠ করে দেখবেন। আপনারা সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করবেন যে, ইসলামের ভালবাসার শিক্ষা এত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ যে, যদিও মসীহ্-এর ভালবাসার শিক্ষাও খুবই সুন্দর, খুবই হৃদয়গ্রাহী এতে কোন সন্দেহ নেই, তথাপি যখন তুলনা করা হয় তখন এমন মনে হয় যে, ইসলামের শিক্ষার তুলনায় ইহার মুখে জ্যোতিঃ থাকে না বিবর্ণ হতে আরম্ভ করে। কিন্তু অবশ্যই নিজ সত্তায় উহা সৌন্দর্য-শূন্য নয়। খুবই প্রিয় ও খুবই হৃদয়গ্রাহী শিক্ষা– এতে কোন মতভেদ নেই। তবে ইসলাম মানব-জীবনের সকল অংশে ভালবাসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। কোন ধর্মে ভালবাসার দর্শন এত বিস্তারিতভাবে আপনি দেখতে পাবেন না। (আল্লাহ্) বলেন, **লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন**- তোমরা পুণ্য কাকে বলে জানোই না, তোমাদের জানা নেই যে, পুণ্য কাকে বলে। যদি একথা না শিখো যে, খোদার পথে সবচে' উত্তম জিনিষ সবচে' প্রিয় জিনিষ কুরবানী করে দেয়া আরম্ভ করা উচিত বা খোদার পথে নিজের সবচে' প্রিয় জিনিষ যদি কুরবানী করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি না হয় তাহলে তোমরা পুণ্যকে চিনতে পারো নি।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঐশী ভালবাসার সর্বোচ্চ মার্গঃ

এ কষ্টি পাথরে যখন আমরা নবীগণকে পরখ করি এবং বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনের অবস্থার ওপরে দৃষ্টি দিই তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনে এ জিনিষ চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছেছে বলে দৃশ্যমান হয়। এমন বহু লোক আছে যারা ভালবাসা দেখায়। তারা মনে করে যে, আমাদের ভাল জিনিস উপস্থাপন করা উচিত এবং পরে চিন্তা করে এবং বিচলিত হয়ে থাকে– এটা দিই কি ওটা দিই ! সুতরাং সুফীদের প্রসঙ্গেও খুবই চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী এ প্রসঙ্গে জানা যায় আর সাধারণ বিশ্বে প্রেমিকদেরও অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। একটি ধারণা হলো যে, এ জিনিষটি আমার খুবই প্রিয়। পরে মনে হলো যে, না, এ জিনিষটি আমার অধিক প্রিয়। আবার মনে হলো যে, অমুক জিনিষটি অধিক এবং শেষে উহাই উপস্থাপন করলো। সুতরাং হুমায়ুনের ব্যাপারে বাবর যখন ইহা চিন্তা করলেন যে, হুমায়ুনের

জীবন বাঁচানোর জন্যে আমি খোদার সমীপে নিজের এমন কোন প্রিয় বস্তু উপস্থাপন করি। বলা হয় যে, বাবর তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন আর ভাবছিলেন যে, আমি এই হিরক, যা আমার খুবই প্রিয় তা দিয়ে দিই। পরে মনে আসলো যে, হিরক কি জিনিস যে, আমি ইহা দিয়ে দিই। পুনরায় মনে আসলো গোটা সাম্রাজ্য আমার খুবই প্রিয়, আমি পুরো সাম্রাজ্যটাই দিয়ে দিচ্ছি। আবার চিন্তা করতে থাকলেন। শেষে এ কথা মনে হলো, তার সত্তা তাকে বলে দেয় যে, তোর নিজের প্রাণই তো তোর নিকট সবচে' প্রিয়। এ সময়ে তিনি এ অঙ্গীকার করলেন এবং খোদার নিকট দোয়া করলেন যে, হে খোদা ! এখন আসলেই আমি বুঝে গেছি যে, আমার নিকট সবচে' প্রিয় আমার জীবন। হে খোদা ! তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও এবং আমার পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দাও। ইতিহাসে লেখা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকেই হুমায়ুনের রোগ আরোগ্য হতে থাকে এবং বাবরের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে।

তাই লোকে চিন্তা করতে থাকে কোন্‌টি প্রিয় এবং কোন্‌টি কম প্রিয়। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইহা চিন্তা করেন নি বরং নিজের সবকিছু কুরবানী করে দিয়েছেন। নিজের ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া, উঠা এবং বসা। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের প্রত্যেক জিনিষ খুব প্রিয় হয়ে থাকে এবং যখন সে অধিক প্রিয় জিনিষ দিয়ে দেয় তখন তার প্রাণে এক প্রকার প্রশান্তি থেকে যায় যে, আমি আমার জন্যে কিছু কম রেখে দিয়েছি। এথেকে কম মানের প্রিয় জিনিষ যখন দিয়ে দেয় তখন তার নিজের হাতেও কিছু না কিছু জিনিষ দৃশ্যমান হয় এবং উহা তখন সবচে' প্রিয় হয়ে যায়। যেসব জিনিষ পেছনে থেকে যায় উহা অধিকতর প্রিয় হতে থাকে। কোন মায়ের সবচে' ছোট আদরের শিশুটি যখন মারা যায় তখন অন্য সন্তানগুলোর প্রতি তার আরো অধিকতর স্নেহ বেড়ে যায় আর এ বিষয়-বস্তু মানব জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ছেয়ে আছে।

সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এই ব্যবসায় করেন নি যে, হে খোদা ! আমি সবচে' প্রিয় জিনিষটি উপস্থাপন করে দিয়েছি অর্থাৎ নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছি এজন্যে এখন অবশিষ্ট জিনিষগুলো আমার রয়ে গিয়েছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, **কুল ইন্না সলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন**– অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ) ! তোমার এসব দাসদের তুমি ভালবাসতে শিখাও যারা তোমার দাসে পরিণত হয়েছে। আমার সাথে কীভাবে ভালবাসা সৃষ্টি করতে হয় তারা তা জানে না। তুমি তাদেরকে ভালবাসার রহস্য শিখাও। এথেকে ইহা জানা হয়ে যাবে যে, যদি খোদার আদেশ না হতো তাহলে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্দার আড়ালে আচ্ছাদিত প্রেমের রহস্য কাউকে বলতেন না। ইহাও একটি আশ্চর্য ধরনের সুন্দর দিক যা আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। আর অবলীলায় অন্তর আরও অধিক পুলকিত হয়েছে। কতক স্থানে আদেশ হিসেবেও খোদাতাআলা তাঁর রহস্যাবলীর

কথা মানব জাতিকে বলে দেয়ার জন্যে বাধ্যবাধক করে দিয়েছেন। নচেৎ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তিনি বলতেন, তখন লোকেরা জানতো যে, এত সুন্দর এ মর্যাদার নবী যিনি এতটা বিনয় স্বভাবাপন্ন। তাঁর জীবনের একটি সুস্পষ্ট দিক তো এই হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁর সৌন্দর্যের ওপরে সর্বদা আবরণ দিতে থাকেন। আর তাঁর দুর্বলতাগুলোকে ঢাকেন না। জড় পূজারী আর খোদা পূজারীর মধ্যে এটাই হলো মৌলিক পার্থক্য। **জড় পূজারীরা নিজের দুর্বলতাসমূহকে ঢাকতে থাকে আর স্বীয় সামান্য সৌন্দর্যকেও উদ্ভাসিত করে এবং দেখিয়ে বেড়ায়। প্রদর্শনী করে আর প্রচারণা তার জীবনের প্রত্যেক অংশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়।**

পরিপূর্ণ উৎসর্গ ও উহার পরিণাম ঃ

খোদাতাআলা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে আদেশের মাধ্যমে এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমার কতক সৌন্দর্য যা কিনা আমার দৃষ্টিতে আছে– তোমার দাসগণেরও ওসব জানবার অধিকার রয়েছে। এজন্যে যে, তারাও তো তোমার আনুগত্য করে আমার সমীপে পৌঁছুতে পারে।

এর মধ্যে একটি ছিলো এই যে, নিজের সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং নবীদের এই সুন্নত ও রীতি যে, তাঁরা নিজেদের সব কিছু দেবার খাতিরে একথা চিন্তা করতে থাকেন যে, আর কী দেয়া যায় আর কীইবা দিতে পারি। নিজের সন্তান-সন্ততিতে উপস্থাপন করে দেয়। কখন কখন ভাবী সন্তানকেও উপস্থাপন করে দিয়ে থাকে। পুণ্যবানগণেরও এই রীতি। নবীগণ ব্যতিরেকে যেভাবে হযরত মরিয়মের মাতা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, **রব্বি ইন্নী নায়ার্‌তু লাকা মা ফী বাত্‌নী মুহার্‌ররান ফা তাক্‌ব্বাল মিন্নী-ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল আলীম** (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ৩৬)।

অর্থাৎ হে আমার প্রভু ! যা কিছুই আমার গর্ভে আছে আমি তা তোমার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি। আমি জানি না-কী আছে। মেয়ে আছে কি ছেলে ? ভাল কি মন্দ। কিন্তু যা কিছু আছে, আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। **ফাতাক্‌ব্বাল মিন্নী**– আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। **ইনাকা আনতাস্ সামী'উল আলীম – তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ**। অর্থাৎ শুনে থাকো আর জ্ঞাত থাকো। এ বিষয়ের একটি পৃথক সম্পর্ক আছে। এজন্যে এর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যাই হোক হযরত মরিয়মের মাতা ইমরানের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার দোয়া খোদাতাআলার এতই পসন্দ হয়েছিলো যে, উহাকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে কুরআন করীমে সংরক্ষিত করলেন।

এভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সন্তানের জন্যে তাঁর দোয়া এবং তাঁদের সন্তানদের জন্যে অন্যান্য নবীর দোয়া-এসব কুরআন করীম সংরক্ষণ

করেছে। কখনও আপনি বাহ্যিকভাবে ওয়াকফ ও উৎসর্গের বিষয়-বস্তু দেখতে পাবেন না যেভাবে এখানে এসেছে **মুহার্‌রবান**– হে খোদা ! আমি এ সন্তানকে তোমার পথে উৎসর্গ করছি। কিন্তু কখনও কখনও আপনি এ দোয়া দেখতে পাবেন যে, হে খোদা! যে কল্যাণ তুমি আমাকে দিয়েছো তা আমার সন্তান-সন্ততিকে দান করো এবং তাদের মধ্যেও কল্যাণ ধারা প্রবাহিত করো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ রঙ্গে দোয়া করেছেন। কিন্তু যদি প্রকৃত অর্থে আপনি চিন্তা করেন যে, যে কল্যাণ যাচ্‌ঞা করা হচ্ছে উহা পরিপূর্ণ উৎসর্গ। পরিপূর্ণ উৎসর্গ ব্যতিরেকে নবুওয়ত হতেই পারে না। আর সবচে' অধিক বরং মানব গোষ্ঠী থেকে মুক্ত অর্থাৎ **মুহার্‌ররান** এবং খোদার দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকেন।

তাই আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এই যে, যখন কোন ব্যক্তি এ দোয়া করে যে, আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যে নবুওয়তের ধারা প্রবাহিত করো তখন এ দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, আমার সন্তান-সন্ততিকে আমার ন্যায় দাসের দাস দাসের দাস বানাতে থাকো। নিজ ভালবাসার ও নিজ আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে থাকো। এমন কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করো যেন তাদের মধ্যে স্বাধীনতার কোন অংশ না থাকে। তুমি **মুহার্‌ররান**- এর মোকাবিলায় পৃথিবী থেকে মুক্ত করে আমি তোমার ওপরে দায়িত্বভার অর্পণ করছি। এ বিষয়-বস্তু ওয়াকফের প্রসঙ্গে আরও উচ্চস্তরের যে, আমার সন্তান-সন্ততিকে তুমি তোমার দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নাও আর তাদের কোন প্রকারেই যেন স্বাধীনতা না তাকে।

যাই হোক ইহাও একটি দিক যে, যা কিছু ছিলো তা-তো খোদার পথেই দিয়ে দিয়েছি কিন্তু যা কিছু হাতে এখনও আসে নি তা-ও উপস্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে চিল্লা-কশি করেছিলেন তা-ও এ বিষয়-বস্তুর আওতাধীন এসে যায়। তিনি চল্লিশ দিন এ আকুতি-মিনতি করতে থাকেন। দিন-রাত্র বলেন যে, হে খোদা ! আমাকে সন্তান দাও আর উহা দাও যা তোমার দাসত্বের অধীন হয়ে যায় এবং আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্যে একটি তোহ্‌ফা ও উপহারে পরিণত হয়।

আগামী শতাব্দীকে সম্বর্ধনা দেবার প্রসঙ্গে একটি খুবই কল্যাণমণ্ডিত আন্দোলনের ঘোষণা ঃ

সুতরাং আমি ইহা চিন্তা করলাম যে, সমগ্র জামাতকে আমি এ কথার ওপরে প্রস্তুত করি যে, আগামী শতাব্দীতে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে যেখানে আমরা দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সন্তান-সন্ততি তৈরী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সেখানে নিজেদের ভাবী সন্তানদিগকে খোদার পথে এখন থেকেই ওয়াক্‌ফ ও উৎসর্গ করি আর এ দোয়া করি যে, হে খোদা ! আমাকে একটি পুত্র

সন্তান দাও, কিন্তু যদি তোমার সকাশে কন্যা হওয়াই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কন্যাই তোমার সন্নিধানে উপস্থিত করছি। **মা ফী বাত্বনী**– যা কিছুই আমার গর্ভে রয়েছে, মায়েরা এ দোয়া করুন আর পিতাও ইব্রাহীমি দোয়া করুন যে, হে খোদা ! আমাদের সন্তানকে নিজের জন্যে মনোনীত করো তাকে তোমার নিজের করে নাও, তোমারই করে নাও। এবং **আগামী শতাব্দীতে এক মহান উৎসর্গীকৃত সন্তানগণের বাহিনী সারা বিশ্বে এভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছে যে, তারা পৃথিবী (পূজা) থেকে স্বাধীন হচ্ছে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খোদার দাসে পরিণত হয়ে ঐ শতাব্দীতে প্রবেশ করছে। ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে আমরা খোদার সকাশে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করছি।**

আর এ উৎসর্গের সবিশেষ প্রয়োজন। আগামী শত বর্ষে যেখানে বিপুল হারে ইসলামকে প্রত্যেক স্থানে বিস্তার দিতে হবে সেখানে লক্ষ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাসদের প্রয়োজন, যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খোদার দাস হবে, তারা জীবন উৎসর্গকারীও হবে। বিপুল সংখ্যায় ও প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশ থেকে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রয়োজন।

এর পূর্ব থেকেই আমি ঘোষণা করতে থাকি। খুবই চেষ্টা চালাতে থাকি। কিন্তু সাধারণভাবে কতক বিশেষ শ্রেণীর লোক কার্যতঃ নিজদিগকে জীবন উৎসর্গকারী হিসাবে ব্যতিক্রম মনে করে। কার্যতঃ জামাতের যেসব উৎসর্গকারী লাভ হতে থাকে তা জীবনের সকল পর্যায় থেকে আসে নি। কতক খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও নিজেদের সন্তানকে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে পার্থিব দৃষ্টিতে যে শ্রেণীকে খুব একটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় না অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর এবং মাঝামাঝি যে শ্রেণী রয়েছে তাদের মধ্য থেকে সন্তান-সন্ততি উপস্থাপিত হতে থাকে। এ শ্রেণী থেকে উৎসর্গকারী আসা এসব জীবন উৎসর্গকারীদের সম্মান বৃদ্ধি করার কারণ, সম্মান হানি করার কারণ নয়। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী থেকে না আসা এসব শ্রেণীর সম্মান হানি করার অবশ্য কারণ হবে।

অতএব আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বর্ণনা করছি যে, কেউ যেন ভুলবশতঃ ইহা না মনে করে যে, নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক (আমরা এথেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি) জামাত এথেকে বঞ্চিত না থেকে যায় এবং জামাতের সম্মানে হানি ঘটে। যদি বাহ্যিক সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের সন্তানদের উৎসর্গ না করে – ইহা বলতে চাই যে, তাদের সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না। যারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বে সম্মানিত খোদার দৃষ্টিতে তারা নিজেদেরকে নিজেরা ভবিষ্যতে লাঞ্ছিত করতে থাকবে। যদি তারা খোদার সকাশে নিজেদের সন্তানদের উৎসর্গ করার রহস্য না শিখে আর এমন দৃঢ় বিশ্বাস না করে নেয় যে,

নবীগণের সন্তানগণ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কেউ সম্মানিত হতে পারে না– তাঁরা এ বিনয়ের সাথে উৎসর্গ করেছেন, এভাবে অনুনয় বিনয় করে দোয়া করতে করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে উৎসর্গ করেছেন যে, মানুষ তাদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়।

জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ উৎসর্গকারী আসা উচিত ঃ

আগামী শতাব্দীতে জীবন উৎসর্গকারীগণের অতীব প্রয়োজন যে, জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় জীবন উৎসর্গকারীগণকে এ শতাব্দীর সাথে আমরা প্রকৃতপক্ষে খোদার সন্নিধানে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকবো। কিন্তু এর প্রয়োগ তো এ শতাব্দীর লোকদেরই করতে হবে। যাই হোক, এ উপহার আমরা এ শতাব্দীকে দেবোই। এজন্যে যাদেরই সৌভাগ্য হয় তারা উপহারের জন্যে যেন প্রস্তুত থাকেন।

হতে পারে, এ নিয়্যতে এ উপহারের প্রসাদে কতক এমন পরিবার যাদের সন্তান-সন্ততি জন্মে না, এমন স্বামী-স্ত্রী যারা কোন না কোনভাবে সন্তানাদি থেকে বঞ্চিত– আল্লাহ্‌তাআলা কুরবানীর আত্মাকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাদেরও সন্তান-সন্ততি দিয়ে দেন। খোদাতাআলা ইতঃপূর্বে ইহা করে দেখিয়েছেন। যেসব নবী সন্তানের জন্যে দোয়া করেছিলেন, উৎসর্গের খাতিরে দোয়া করছিলেন, কখনও কখনও বৃদ্ধ বয়সেও তাদের সন্তান হয়ে যায়। এমন আকারেও হয়ে যায়, স্ত্রী-ও বন্ধ্যা এবং স্বামীও বৃদ্ধ। হযরত যাকারিয়াকে দেখুন কত মর্যাদাসম্পন্ন দোয়া করেছেন ! এ আবেদন করেছেন যে, হে খোদা ! আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমার মাথা (বার্ধক্যের কারণে) উত্তপ্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সের শিখায় হাড় পর্যন্ত জ্বলে গেছে। আমার স্ত্রী-ও বন্ধ্যা, সন্তান হচ্ছে না, সন্তান জন্ম দেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই। কিন্তু আমার এ আকাঙ্ক্ষা যে, তোমার পথে একটি সন্তান উপস্থাপন করি। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো। **ওয়ালাম আকুম বি দু'আইকা রব্বি শাক্বীয়া**– হে আমার প্রভু ! আমি তোমার সন্নিধানে এ দোয়া করতে করতে কখনও নিরাশ হই নি ! কখনও কোন দোয়া থেকে তোমার সকাশে নিরাশ হই নি– 'শাক্বিয়া' শব্দটি বিস্ময়কর, ব্যাপক ও বাগ্মিতা সম্বলিত। এর উদ্দেশ্য এই যে, হে খোদা ! আমি এমন পোড়া কপালে তো নই যে, তোমার সন্নিধানে দোয়া করি আর নিরাশ হয়ে যাই এবং ক্লান্ত হয়ে যাই। এমন মহিমার সাথে ও ব্যথা-বেদনার সাথে এ দোয়া করেছিলেন যে, ঐ দোয়ার অবস্থায়ই আল্লাহ্‌ বলে দিলেন যে, আমরা তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি। স্বয়ং তার নাম রাখেন। এর মধ্যে খোদাতাআলার মহান ভালবাসার প্রকাশ রয়েছে। আশ্চর্যজনক গ্রন্থ কুরআন করীম। এমন সব প্রিয় ভঙ্গীমা শিখিয়েছে যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। আপনাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আপনি চিন্তা করেন কি নাম রাখবেন আর এমন আবেগ নিয়ে যে, পরম ভালবাসা জামাতে আহমদীয়ায় প্রত্যেক যুগে খলীফার সাথে হয়ে থাকে, কতক লোক-বরং বহু

লোক আমাকে লিখে থাকেন। তাই আল্লাহ্‌তাআলা পূর্বাহ্নে তাঁকে অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া যেভাবে বলেন, আমি তার কি নাম রাখবো বা চিন্তা করেন যে, কি নাম রাখবো ? সুসংবাদের সঙ্গেই বলেছেন– **ইসমুহু ইয়াহ্‌ইয়া**– আমরা নাম রাখছি। হযরত যাকারিয়ার সাথে এমন ভালবাসা ছিলো। এ তো ছিলো হযরত যাকারিয়ার দোয়ার সাথে ভালবাসা।

আগামী শতাব্দীতে খোদার সকাশে উপস্থাপনযোগ্য উপহার ঃ

অতএব এমন রঙ্গে আপনারা আগামী শতাব্দীতে যা কিনা খোদার সন্নিধানে উপহার পাঠাচ্ছেন, তা ধারাবাহিকতার সাথে হতে থাকবে– ধারাবাহিকতার সাথে আহমদীরা আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে অগণিত চাঁদা দিচ্ছেন। আর্থিক কুরবানী করে যাচ্ছেন-সময়ের কুরবানী করে যাচ্ছেন– জীবন উৎসর্গকরণও এমন একটি উপহার যা ভবিষ্যতের উপহার। উহা অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিলো। আমাকে খোদাতাআলা এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, আমি যেন আপনাদের বলে দিই যে, আগামী দু'বছরে এ অঙ্গীকার করুন, যার যে সন্তান ভাগ্যে জুটে তা যেন খোদার সকাশে উপস্থাপন করে দেয়া হয়। আর যদি আজ কতিপয় মা গর্ভবতী থাকেন তাহলে তারাও এ তাহরীকে, যদি ইতঃপূর্বে অন্তর্ভুক্ত হতে না পেরে থাকেন– তাহলে এখন হয়ে যান, ইহাও অঙ্গীকার করে নিন। কিন্তু মা-বাবাকে মিলিতভাবে অঙ্গীকার করতে হবে। উভয়কে একত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেন এ প্রসঙ্গে সন্তানের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে একটি সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং শিশু থেকেই তাদের উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং উন্নত প্রশিক্ষণের সাথে তাদেরকে শৈশবকাল থেকেই এ কথার ওপরে সন্তুষ্টির সাথে প্রস্তুত করান যে, **তোমরা এক মহান উদ্দেশ্যে, এক মহান মর্যাদাপূর্ণ সময়ে জন্ম নিয়েছো, যখন কিনা ইসলামের বিশ্ববিজয়ের এক শতাব্দী ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের দ্বিতীয় শতাব্দীর সাথে মিলে গিয়েছে। এ যুগ-সন্ধিক্ষণকালে তোমাদের জন্ম হয়েছে এবং এই নিয়্যত ও সংকল্প এবং দোয়ার সাথে আমরা তোমাকে খোদার নিকট যাচ্‌ঞা করেছিলাম যে, হে খোদা ! তুমি ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রশিক্ষণের জন্যে এদেরকে মহান মুজাহিদে পরিণত করে দাও। যদি এভাবে দোয়া করতে থেকে লোকেরা নিজেদের ভাবী সন্তানদিগকে উৎসর্গ করে তাহলে আমার দৃঢ়-বিশ্বাস যে, এক অতীব সুন্দর ও অতীব প্রিয় প্রজন্ম আমাদের চোখের সম্মুখে দেখতে দেখতে নিজেদেরকে খোদার পথে উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে,** আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আমীন– তথাস্তু।

[৩রা এপ্রিল, ১৯৮৭ তারিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা]

এ সব শিশুর ব্যাপারে আমাদের করণীয়

দুই

বিষয় নির্দেশিকা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ওয়াকেফীনে নও সন্তানদের ব্যাপারে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন	৩৪
২।	ঐতিহাসিক ওয়াকফে নও তাহরীকের আরও ২ বছরের সময়-সীমা বৃদ্ধি	৩৪
৩।	ওয়াকেফীন শিশুদের পিতা-মাতার ওপরে যেসব দায়িত্বাবলী বর্তায়	৩৫
৪।	বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপনযোগ্য ওয়াকেফীন ও তাদের শ্রেণীভেদ	৩৬
৫।	পিতা-মাতা ওয়াকেফীনদের ওপরে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন	৩৮
৬।	সন্তানদের মধ্যে উত্তম চরিত্র সিঞ্চনের মাহাত্ম্য	৩৮
৭।	ওয়াকেফীনে নও শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা	৪০
৮।	শিক্ষায় ব্যাপকতা সৃষ্টির গুরুত্ব	৪১
৯।	আত্ম-নিয়ন্ত্রিত রীতি-নীতি	৪৩
১০।	আর্থিক বিষয়াদিতে বিশেষ সাবধানতার শিক্ষা	৪৫
১১।	হোঁচট থেকে রক্ষা করায় কতক জরুরী সাবধানতা অবলম্বন	৪৬
১২।	আগামী শতাব্দীতে মহান নেতৃত্ব দেবার যোগ্য তরবীয়ত	৪৮
১৩।	ওয়াক্‌ফে নও শিশুদের মধ্যে বিশ্বস্ততার উপকরণ সৃষ্টি করুন	৪৯

খোদাতাআলার আশিসক্রমে ঐতিহাসিক ওয়াকফে নও তাহরীকে ১২শ' এরও অধিক শিশুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। (বর্তমানে ইহা প্রায় ১৯ হাজার হয়েছে-অনুবাদক) আমার প্রত্যাশা ছিলো যে, আমরা কমপক্ষে ওয়াক্‌ফে নও হিসেবে ৫ হাজার শিশুকে খোদার সমীপে উৎসর্গ করি।

স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণকারী অনেক পিতা-মাতার অনুরোধে তাহ্‌রীকে ওয়াকফে নও-এর সময়সীমা আপাততঃ দু'বছর বৃদ্ধি করা হলো। ওয়াকফে নও সন্তানদের পিতা-মাতার ওপরে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্বাবলী অর্পিত হয়।

তাদের এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক যে, তারা আগামী শতাব্দীতে মহান নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরাতুল ফাতিহা তিলাওয়াত করার পরে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

ওয়াকেফীনে নও সন্তানদের ব্যাপারে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন ঃ

আগামী শতাব্দীর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তুতি ওয়াকেফীনে নও-এর উৎসর্গীত সন্তানদের সাথে রয়েছে। আমি ওয়াকফে নও-এর যে তাহরীক ও ঘোষণা করেছিলাম এর ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলার আশিসক্রমে ১২শ'-এরও অধিক এমন শিশুর খবর পাওয়া গেছে, যাদের প্রসঙ্গে ওয়াকফে নও-এর উদ্দেশ্যে দোয়া করতে গিয়ে খোদার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছিলো আর আল্লাহ্তাআলা স্বীয় আশিসক্রমে নিরাপদে ও সুস্থাবস্থায় তাদের প্রসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এসব ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে আগামী শতাব্দীর ওয়াকেফীনে নও বলা হয়। এতদ্ব্যতিরেকে ধারাবাহিকতার সাথে আরও বহু চিঠি আসা অব্যাহত আছে। আমার দৃষ্টি-পটে এ প্রসঙ্গে দু' পর্যায়ের প্রস্তুতি রয়েছে। কিন্তু এর আগে আমি ঐ প্রস্তুতি সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলে দিতে চাই যে, ওয়াকফে নও-এর জন্যে যে সংখ্যার আশা করা গিয়েছিলো তত সংখ্যা বরং উহার এক অংশও এখন পর্যন্ত পুরো হতে পারে না। আর আমি যতটা পরিসংখ্যান নিয়েছি তাতে সংবাদ পৌছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ত্রুটি আছে। বহু দেশ এমন রয়েছে যেখানে সাধারণ সদস্যদের নিকটে এ কথা পৌছানোই হয় নি। আর যেসব দিনে এই তাহরীক করা হয়েছিলো ঐসব দিনে ক্যাসেটের ব্যবস্থা এখনকার তুলনায় দুর্বল ছিলো। আফ্রিকা এবং এ রকম অন্যান্য দেশগুলোতে যেখানে উর্দূ ভাষা বুঝা যায় না এবং কতক এলাকায় ইংরেজী ভাষাও বুঝা যায় না সেখানে অনুবাদ করে ক্যাসেট ছড়িয়ে দেয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা ছিলো না। এ কারণে সরাসরি তাহরীকটির যে প্রভাব হতে পারতো তাথেকে বহু আহমদী এলাকা বঞ্চিত থেকে গেছে। এতদ্ব্যতিরেকে কার্যকরীভাবে এ তাহরীককে পৌছানোও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলো; কিন্তু কতক স্থানে এ দায়িত্ব পালন করা হয়েছে আর কতক স্থানে পালন করা হয় নি বা আন্মনাভাবে পালন করা হয়েছে। কেবল বাণী পৌছানোই যথেষ্ট হয় না। কীরূপ আবেদন ও উদ্দীপনার সাথে বাণী পৌছানো হয়, কীরূপ পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা এবং নিষ্ঠার সাথে বাণী পৌছানো হয় এর সাথে বাণী গ্রহণ করা গভীর সম্পর্ক রাখে।

ঐতিহাসিক ওয়াকফে নও তাহরীকের সময়-সীমা আরও ২ বছর বৃদ্ধি

বিশ্বে বিভিন্ন নবীর জন্ম হয়েছে। মৌলিকভাবে তাদের একই বাণী ছিলো অর্থাৎ বান্দার নামে খোদার বাণী। কিন্তু যে মর্যাদার সাথে ঐ বাণী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পৌছিয়েছেন ঐ মর্যাদায় আর কেউ পৌছাতে পারেন নি। আর যতটা মাহাত্ম্য ও মূল্য এবং উৎসর্গের আত্মা ও

শক্তি নিয়ে তাঁর (সঃ) বাণী গ্রহণ করা হয়েছে নবীদের ইতিহাসে এতটা মাহাত্ম্য ও মূল্য এবং কুরবানীর আত্মা ও শক্তির সাথে আর কোন নবীর বাণী গ্রহণ করা হয় নি। এজন্যে বাণী পৌছানোই যথেষ্ট নয়। **কী রঙ্গে কীরূপ আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে, কতটা নিষ্ঠার সাথে, কোন মার্গের প্রেম ও ভালবাসার সাথে দোয়া করতে করতে বাণী পৌছানো হয় - এসব বিষয় দ্বারাই বাণীর গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকে।** এজন্যে আমি চাচ্ছিলাম যে, কমপক্ষে আমরা খোদার সমীপে ৫ হাজার শিশুকে ওয়াকফে নও হিসেবে উপস্থাপন করে দিই। এ সংখ্যা পুরো করতে এখনও অনেক পথ বাকী রয়ে গেছে। কতক বন্ধু ইহা লিখেছেন যে, তাদের ধারণা ছিলো বা আমি প্রথম প্রথম খুতবায় বলেছিলাম তাতে সময় সময় এ ফল বের হয়ে থাকবে যে, যেসব শিশু এ শতাব্দী শেষ হওয়ার প্রারম্ভকালে জন্ম নিবে তাদেরকে ওয়াকফে নওদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর পরে এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কতক বন্ধুর পত্রে যেভাবে জানা যাচ্ছে যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে কিন্তু ইহা মনে করে যে, এখন সময় নেই তাই তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সফলকাম হচ্ছেন না। তাদের জন্যে এমনকি সারা বিশ্বের জামাতগুলোর জন্যে যেখানে এখনও বাণী পৌছেই নি এ ঘোষণা করছি যে, ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে সময়-সীমা আরও ২ বছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং আপাততঃ এ সময় দু'বছরের জন্যে বৃদ্ধি করা হচ্ছে যেন আকাঙ্ক্ষা রাখেন এমন বন্ধুগণও এ প্রথম তাহরীকে অংশগ্রহণ করেন। নচেৎ এ তাহরীক তো বারে বারে হতেই থাকবে। কিন্তু বিশেষ করে **এই ঐতিহাসিক তাহরীক যাতে আগামী শতাব্দীর জন্যে উৎসর্গীকৃত শিশুদের প্রথম বাহিনী তৈরী হচ্ছে উহার সময় সীমা আগামী ২ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে জামাতসমূহ চেষ্টা করুন এবং যতটা সম্ভবপর এ বাহিনী যেন অবশ্যই পাঁচ হাজারের হয়ে যায়, এথেকে যদি বেড়ে যায় তাহলে আরও ভাল কথা।**

ওয়াকেফীন শিশুদের পিতা-মাতার ওপরে যেসব দায়িত্বাবলী বর্তায় ঃ

অনেক পিতা-মাতা আমাকে লিখছেন যে, এসব শিশুদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী ? তাই যেভাবে আমি বলেছিলাম যে, এর দু'টি অংশ। প্রথম এই যে, জামাতের ব্যবস্থাপনাকে কী করতে হবে ? দ্বিতীয়তঃ শিশুর পিতা-মাতার কী করতে হবে ? ব্যবস্থার সাথে যতটা সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে আমি সময়ে সময়ে নির্দেশাদি দিয়ে আসছি। আর যেসব নতুন চিন্তাধারা আমার মনে আসছে বা কতক বন্ধু পরামর্শ হিসেবে লিখছেন ওগুলোকেও এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু যতটা পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রাখে আজ আমি এ দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলে দিতে চাই।

খোদার সমীপে শিশুকে উপস্থাপন করা একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইহা কোন মামুলী কথা নয়। আর আপনারা স্মরণ রাখুন ঐসব লোক যারা নিষ্ঠা ও আদরের সাথে কুরবানী দিয়ে থাকে তারা নিজেদের ভালবাসা অনুযায়ী ঐ কুরবানীসমূহকে সুসজ্জিত করেও উপস্থাপন করে থাকে।

কুরবানীসমূহ ও উপহার প্রকৃতপক্ষে একই বিষয়-বস্তুর অধীনে আসে। আপনারা বাজারে কেনা-কাটা করে থাকেন। সাধারণ দ্রব্যাদি এমন যা ঘরের জন্যে আনেন ওগুলোকে রীতিমত খুব সুন্দর কাগজে মুড়িয়ে এবং ফিতা দ্বারা বেঁধে সজ্জিত করে আপনাদেরকে দেয় না। কিন্তু যখন আপনি বলেন, আমি ইহা উপহার দেবার জন্যে নেবো তখন দোকানদার বড়ই যত্নের সাথে উহাকে সাজিয়ে উপস্থিত করে। অতএব কুরবানীসমূহ উপহারের রং ধারণ করে থাকে। আর উহার সাথে সাজ-সজ্জাও প্রয়োজনীয়। আপনারা দেখে থাকবেন যে, কতক লোক তো ভেড়া ও বকরীগুলোকেও খুবই সজ্জিত করে থাকে। কেউ তো ওগুলোকে অলংকার দিয়ে সজ্জিত করে কুরবানী দেবার স্থলে নিয়ে যায়। ফুলের মালা পরায় এবং বিভিন্ন রকম সজ্জিত করে থাকে। মানবীয় কুরবানীর সাজ অন্য রকমের হয়ে থাকে। মানুষের জীবনের সাজ-সজ্জা তাকওয়া ও খোদা-ভীতির দ্বারা হয়ে থাকে। আল্লাহ্তাআলার স্নেহের পরশ ও উহার ভালবাসার ফলশ্রুতিতে মানবীয় আত্মা সজ্জিত হয়ে তৈরী হয়ে থাকে। সুতরাং এসব শিশুর ব্যাপারে এতটা বড় হবার আগে যে, জামাতের দায়িত্বে অর্পণ করা হয় এ সময়ে মা-বাবার দায়িত্ব অনেক বিরাট। এসব কুরবানী ও উৎসর্গকে এমনভাবে প্রস্তুত করুন যে, তাদের অন্তরের হাহাকার পূর্ণ হয়, যে মর্যাদার সাথে তারা খোদার সমীপে একটি অসাধারণ উপহার উপস্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপনযোগ্য ওয়াকেফীন ও তাদের শ্রেণীভেদ ঃ

ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ওয়াকেফীন জামাতের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে উহার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিতে থেকে আমি বুঝাচ্ছি যে, কয়েক প্রকার ওয়াকেফীন হয়ে থাকে। কিছু তো এ রকম ছিলেন যারা অধিক বয়সে এমতাবস্থায় নিজেদেরকে নিজেরা উপস্থাপন করেছেন যখন সৌভাগ্যবশতঃ তাদের নিজেদের চরিত্রগঠন ও প্রশিক্ষণ খুবই উন্নত স্তরের হয়েছিলো। আর যদি তারা ওয়াকফ ও উৎসর্গ না-ও করতেন তবুও তারা ওয়াকফের আত্মাকে সমুন্নত রাখার অধিকারী ছিলেন। তারা ছিলেন সাহাবাগণের সন্তান-সন্ততি বা প্রাথমিক তাবেঈনদের সন্তান-সন্ততি। তারা উত্তম পরিবেশে উত্তমভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। খোদাতাআলার আশিসক্রমে উত্তম স্বভাব ও প্রকৃতিতে সজ্জিত লোক ছিলেন। ওয়াকেফীনের এ দল খোদাতাআলার আশিসক্রমে প্রত্যেক স্তরে জীবনের প্রত্যেকটি দিকে খুবই সফলকাম ছিলেন।

পরে এমন একটি সময় আসলো যখন কিনা সন্তানদেরকে উৎসর্গ করা আরম্ভ হয়ে গেলো। অর্থাৎ পিতা-মাতা নিজ সন্তান-সন্ততিকে স্বয়ং ওয়াক্‌ফ করতে চাইলেন। এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের ওয়াকেফীন আমাদের সম্মুখে আসতে থাকলো। এমন অনেকে আছে যাদের ব্যাপারে পিতা-মাতা মনে করতে থাকেন যে, যখন আমরা তাদেরকে জামাতের স্কন্ধে ন্যস্ত করবো তখন তা (জামাত) স্বয়ংই তাদের চরিত্র গঠন করবে এবং এই সময়-সীমার মধ্যে এদের প্রতি তাদের দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই। অতএব যখন তারা জামেয়া আহমদীয়াতে (ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) উপস্থাপিত হতে থাকলো তখন একেবারেই (Raw Material) কাঁচা মাল অর্থাৎ এমন অপরিপক্ক মালের ন্যায় উপস্থাপিত হতে থাকে যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপমিশ্রণও যুক্ত হয়ে থাকে। উহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এক কঠিন কাজ হয়ে থাকে। তাদেরকে ওয়াকফের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী গঠন করা খুবই কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর কতক বদস্বভাব নিয়ে তারা আসে যে, জামাত এতটা চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু আসল ঘটনা এই যে, কতক ছেলেকে জামেয়াতে চুরির কারণে ওয়াকফ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কাউকে মিথ্যার কারণে ওয়াকফ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখন এসব কথা এমনই যে, যার সম্বন্ধে চিন্তাও করা যেতে পারে না যে, ভাল পুণ্যবান ও সালেহ আহমদীর মধ্যে কোথায় ইহা পাওয়া যায় যে, জীবন ওয়াকফকারীদের মধ্যে পাওয়া যাবে ? কিন্তু ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, পিতা-মাতা উপস্থাপন তো করে দিয়েছেন কিন্তু তরবীয়তের দিকে দৃষ্টি দেন নি। অথবা এতদিন পরে তাদের ওয়াকফ-এর কথা মনে এসেছে যে, তখন তরবীয়তের সময় আর অবশিষ্ট নেই। কতক পিতা-মাতা থেকে তো ইহাও অবগত হওয়া গেছে যে, তারা এ কারণে সন্তানকে ওয়াকফ করেছিলেন যে, তাদের স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো এবং তারা মনে করতেন যে, এভাবে তারা ঠিক হবে না, ওয়াকফ করে দিই তাহলে স্বয়ং জামাত শামলাবে ও ঠিক করে দেবে। যে ভাবে পুরোনো দিনে কখনও কখনও খারাপ সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে বলা হতো, বেশ, তাকে দারোগা বানিয়ে দেবো। তাই জামাতে যেহেতু পুণ্যের আত্মা রয়েছে এজন্যে তাদের দারোগার কথাতো মনে আসে না কিন্তু ওয়াকফে জিন্দেগী বানানোর চিন্তা আসে। যদিও দারোগাগিরীর সাথে এসব শিশুদের সম্পর্ক হতে পারে কিন্তু ওয়াক্‌ফের সাথে কোনক্রমেই সম্পর্ক হতে পারে না। এসব লোক অনেক দূরের কথা চিন্তা করে থাকে। দারোগাগিরী তো হাস্যকৌতুকের কথা কিন্তু ইহাতো ব্যথা-বেদনাপূর্ণ ঘটনা। উহাতো একটি হাস্যকর কাহিনী হিসেবে বিখ্যাত রয়েছে। কিন্তু ইহা তো জীবনের একটি অনেক বড় করুণ দৃশ্য যে, খোদার সকাশে উপস্থাপন করার জন্যে নষ্ট সন্তানই দৃষ্টিতে আসে, সর্বৈব অকর্মণ্য সন্তানের প্রতি দৃষ্টি যায়, যাকে এমন কুঅভ্যাসসমূহের সাথে বড় করা হয়েছে যে, আপনারা উহা শোধরাতে পারেন নি।

পিতা-মাতা ওয়াকেফীনদের ওপরে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন ঃ

এজন্যে সন্তানদের যে তাজা চালান আসছে তাদের জন্যে আমাদের নিকট খোদার আশিসক্রমে বহু সময় আছে। আর যদি এখন আমরা তাদের প্রতিপালন ও চরিত্র গঠনে অমনোযোগী থাকি তাহলে খোদার নিকটে অপরাধী সাব্যস্ত হবো। আর ইহাতো বলা যাবে না যে, একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে গেছে। এজন্যে পিতা-মাতার উচিত যে, ঐসব সন্তানদের ওপরে সর্বপ্রথম গভীর দৃষ্টি রাখেন আর আমি যেভাবে বলবো, কতক তরবীয়তি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন আর যদি খোদা না করুন তারা বুঝতে পারেন যে, সন্তান স্বভাবজ অযোগ্যতার কারণে ওয়াকফের যোগ্য নয় তাহলে বিশ্বস্ততা ও খোদা-ভীতির ভিত্তিতে জামাতকে অবহিত করা উচিত তাদের যে, আমি পরিচ্ছন্ন নিয়্যতে খোদার সন্নিধানে একটি উপহার উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ সন্তানের মধ্যে অমুক অমুক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যদি এতদ্‌সত্ত্বেও জামাত তাকে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয় তাহলে আমি উপস্থিত আছি নচেৎ ঐ ওয়াকফকে রহিত করে দেয়া হোক। অতএব এ পদ্ধতিতে বড়ই গুরুত্ব সহকারে এখন আমাদের ঐ ভবিষ্যত ওয়াকেফীনদেরকে গড়ে তোলা আবশ্যক।

সন্তানদের মধ্যে উত্তম চরিত্র সিঞ্চনের মাহাত্ম্য ঃ

উত্তম চরিত্রের সাথে যতটা সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে যে গুণাবলী জামাতের মধ্যে দৃশ্যমান হওয়া আবশ্যক ঐসব গুণাবলীই ওয়াকেফীনদের মধ্যে পরিদৃশ্য হওয়া উচিত– বরং তাদের মধ্যে উত্তম মানের দৃশ্যমান হওয়া উচিত। এই উত্তম গুণাবলী বা চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিভিন্ন খুতবায় আপনাদের সম্মুখে বিভিন্ন কর্মসূচী উপস্থাপন করেছি। এসব শিশুদের চরিত্র গঠন প্রসঙ্গে এর সবগুলোকে সবিশেষ দৃষ্টি-পটে রাখা উচিত।

সংক্ষেপে প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারী শিশু যাকে ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে শৈশব কাল থেকেই সত্যতার প্রতি অনুরাগ আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আর এ ঘৃণা যেন মায়ের দুধের সাথে মিশ্রিত থাকে। যেভাবে Radiation (রশ্মি বিচ্ছুরণ) কোন বস্তুর ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে এভাবে প্রতিপালক পিতার বাহুর মাধ্যমে সত্যতা ঐ শিশুর প্রাণে সিঞ্চিত হওয়া উচিত। এর উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতাকে সত্যবাদিতায় আগের চেয়ে আরও অগ্রগামী হতে হবে। ইহা আবশ্যক নয় যে, সব ওয়াকেফীনে জীন্দেগীর পিতামাতার সত্যবাদিতার ঐ উচ্চ মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন যা কিনা উচ্চতর মর্যাদার মু'মিনদের জন্যে আবশ্যক। এজন্যে এখন এ শিশুদের খাতিরে তাদের পিতামাতাদের নিজেদের তরবীয়তের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে আর ঘরের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী সাবধানতার সাথে কথা-বার্তার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

তারা বেহুদা কথার ন্যায় বা হাসি-ঠাট্টা করেও ভবিষ্যতে মিথ্যা কথা বলবেন না। কেননা, ইহা খোদাতাআলার পবিত্র আমানত যা আপনারা আপনাদের ঘরে লালন-পালন করছেন। আর এ পবিত্র আমানতের কিছু চাহিদা রয়েছে যেগুলোকে আপনাদেরকেই পূরণ করতে হবে। এজন্যে এমন সব ঘরের পরিবেশ সত্যতাপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে খুবই স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া দরকার। স্বল্পে-তুষ্টতা সম্বন্ধে আমি বলেছি। ওয়াকেফীনদের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শৈশব থেকেই এসব শিশুদের স্বল্পে তুষ্ট এবং লোভ-লালসার প্রতি অনুৎসাহী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে যদি পিতা-মাতা শুরু থেকেই তরবীয়ত আরম্ভ করেন তাহলে এমন হওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। মোটকথা সাধুতা ও বিশ্বস্ততার উচ্চ মার্গে এসব শিশুকে পৌঁছানো আবশ্যক। এতদ্ব্যতিরেকে শৈশবকাল থেকেই শিশুর আচার-আচরণে উৎফুল্লতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। খিটখিটে মেযাজ ওয়াকফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। খিটখিটে স্বভাবের ওয়াকেফীনে জীন্দেগী জামাতে সর্বদা সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। কখনও কখনও ভয়ানক ফিতনা-বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। এজন্যে সুশীল আচরণ ও এর সাথে সহিষ্ণুতা অর্থাৎ কারও কথা সহ্য করা, এ উভয় গুণ ওয়াকেফীন শিশুদের মধ্যে থাকা অতীব জরুরী।

ঠাট্টা অর্থাৎ কৌতুক ভাল কাজ। কিন্তু কৌতুকের মাঝে পবিত্রতা থাকা আবশ্যক। আর কৌতুকে পবিত্রতা কয়েক প্রকারের হতে পারে। কিন্তু আমার মাথায় এখন বিশেষ করে দু'টি কথা রয়েছে। একতো এই যে, নোংরা কৌতুকের মাধ্যমে নিজ বা অন্যের মনোরঞ্জন করার অভ্যেস থাকা উচিত নয়। আর দ্বিতীয়তঃ এই যে, এর মধ্যে শোভা-সৌন্দর্য যেন থাকে। ঠাট্টা ও কৌতুকের জন্যে আমরা শোভা-সৌন্দর্য শব্দও ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ উহাকে হাস্য--কৌতুক বলে। হাস্য-কৌতুকের অর্থই এই যে, ইহা খুবই সূক্ষ্ম ও উত্তম বিষয়। যে কোন প্রকার কঠোরতা ও কুরুচির সাথে শোভা-সৌন্দর্যের সম্পর্ক নেই বরং রুঢ়তার সাথে সম্পর্ক আছে। সুতরাং হিন্দুস্থানের উন্নত সভ্যতার যুগে যখনই উত্তম ঐতিহ্যবাহী এমন সব পরিবারের কোন শিশু যদি এমন কৌতুক বলতো যা বিশ্রী তাহলে তাকে বলা হতো যে, ইহা কৌতুক নয় ইহা অসদাচরণ, ইহাতো কুরুচিপূর্ণ। সুতরাং কুরুচির প্রকাশ ও হাস্য-কৌতুকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। সুতরাং যেসব হাস্য-কৌতুক যখন আমরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবনে কখনও কখনও দেখতে পাই, যদিও ঐসব হাস্য-কৌতুকের অধিকাংশ ঘটনাবলী এখন সংরক্ষিত নেই এদের মধ্যে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা পাওয়া যেতো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের (রাঃ) জীবনেও হাস্য-কৌতুক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর প্রকৃতিতেও বড়ই হাস্য-কৌতুক বিদ্যমান

ছিলো। কিন্তু ঐসব হাস্য-কৌতুকের সাথে দু'প্রকারেরই পবিত্রতা ছিলো। কিন্তু এমন কতক বন্ধুকেও আমি দেখেছি যে, তারা হাস্য-কৌতুক থেকেতো এ সুযোগ নিয়েছেন যে, হাস্য-কৌতুকে কখনও সময় কাটানো কোন খারাপ কথা নয়। কিন্তু তারা এই পার্থক্য করতে পারেন না যে, হাস্য-কৌতুকের সাথে অবশ্য পবিত্রতা থাকা আবশ্যক। সুতরাং তারা কতক নেহায়েৎ নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ হাস্য-কৌতুকও নিজেদের বৈঠকে বর্ণনা করতে থাকে। আর কতক লোক এথেকে ইহা মনে করে নিয়েছে যে, কোন কম-বেশী তো নেই। যদিও পার্থক্য অনেক বেশীই ছিলো। নিজেদের ঘরে ভাল হাস্য-কৌতুকের প্রচলন করুন, প্রতিষ্ঠা করুন। অথচ খারাপ হাস্য-কৌতুকের বিরুদ্ধে শিশুদের মনে বাল্যকাল থেকেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিন। বাহ্যিকভাবে ইহা খুবই ক্ষুদ্র বিষয় এবং এর ওপরে আমি এতটা সময় নিয়েছি, আমি অবগত আছি যে, মানুষের জীবনে বিশেষ করে ঐ জীবনে, যা দুঃখ-কষ্টের সাথে জড়িত, যা দায়িত্বভারে জর্জরিত আর যা কয়েক প্রকার সুপ্ত টানা-পোড়নে জর্জরিত সেখানে হাস্য-কৌতুক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর মানবীয় মেধাকে ও মনোজগতকে সংরক্ষণ করে থাকে।

অভাবমুক্ত হওয়া থাকা সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলেছি– স্বল্পে-তুষ্টতার পরে আসে অভাবমুক্ত থাকার মর্যাদার কথা। অভাবমুক্ত থাকার ফলশ্রুতিতে যেখানে একদিকে ধনীদের সাথে হিংসা সৃষ্টি হয় না সেখানে গরীবদের সাথে সখ্যতা-অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অভাবমুক্ততার উদ্দেশ্য অবশ্যই এই নয় যে, গরীবদের প্রয়োজন থেকে মানুষ বেপরওয়া হয়ে যায়। মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনাদির চেয়ে অন্যের প্রয়োজনাদির বেলায় উদাসীন হয়ে যায়। ইসলামী অভাবমুক্ত থাকার মধ্যে এমন একটি বিশেষ দিক রয়েছে যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। এজন্যে ওয়াকেফীন শিশুদের এমন হওয়া উচিত যারা গরীবদের দুঃখ-কষ্ট থেকে উদাসীন হয় না কিন্তু ধনীর ধন-সম্পদ থেকে উদাসীন হয়ে যায় এবং কারও ভাল দেখে তাদের যেন কষ্ট না হয় অথচ কাউকে দুঃখে-কষ্টে পতিত দেখে তারা অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে থাকে।

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা

তাদের শিক্ষার সাথে যতটা সম্পর্ক, জামেয়ার শিক্ষার যুগ তো পরে আসবে কিন্তু প্রথম থেকেই এমন শিশুদেরকে কুরআন করীম শিক্ষার ব্যাপারে গাম্ভীর্যের সাথে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আর এতদুদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহ্ জামাতী ব্যবস্থাপনা অবশ্যই কিছু কর্মসূচী তৈরী করবে। এক্ষেত্রে পিতামাতা জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ রাখবেন আর যখন শিশু এমন বয়সে পৌঁছে যে, সে কুরআন করীম ও ধর্মীয় বিষয়ে পাঠ করার উপযুক্ত হয়ে যায় তখন নিজেদের এলাকার

জামাতী ব্যবস্থাপনা বা সরাসরি কেন্দ্রকে লিখে তাদের নিকট থেকে জেনে নিবেন যে, এখন আমরা কীভাবে তাকে উত্তম মানের কুরআন পাঠ শিখাতে পারি এবং পরে কুরআনের অর্থ শিখাতে পারি। কেননা, ক্বারী (যারা সঠিকভাবে শুদ্ধ করে কুরআন পাঠ করে থাকেন– অনুবাদ) দু'রকমের হয়ে থাকে। এক প্রকার তো তারা যারা ভালভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারেন এবং তাদের কণ্ঠে এক প্রকার আকর্ষণীয় শক্তি থাকে আর তাজবীদের (কুরআন করীমের বিভিন্ন অক্ষরের সঠিক উচ্চারণের নিয়ামাবলী –অনুবাদক) দিক থেকে তারা সঠিকভাবে তিলাওয়াতও করে থাকেন। কিন্তু কোন আকর্ষণীয় সূরে তিলাওয়াতে প্রাণ সৃষ্টি হয় না। এমন ক্বারী যদি কুরআন করীমের অর্থ না জানে তাহলে সে তিলাওয়াতে প্রতিমাতো গড়ে দেয় তিলাওয়াতকে জীবিত করতে পারে না। কিন্তু ঐ ক্বারী যে বুঝে তিলাওয়াতও করে থাকে এবং তিলাওয়াতের ঐ বিষয়-বস্তুর ফলশ্রুতিতে তার অন্তরে ঢেউ আন্দোলিত হতে থাকে, তার অন্তর খোদার ভালবাসার আবেগে উছলাতে থাকে, তার তিলাওয়াতে এমন একটি ভাবের সৃষ্টি হয় যা কিনা প্রকৃতপক্ষে তিলাওয়াতের আত্মা। সুতরাং এমন গৃহে যেখানে ওয়াকেফীনে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী) রয়েছে সেখানে তিলাওয়াতের এ দিকটির ওপরে খুবই জোর দেয়া দরকার। যতকমই পড়ানো হোক না কেন তা যেন অনুবাদের সাথে পড়ানো হয়। উদ্দেশ্য বুঝিয়ে পড়ানো হয়। আর শিশুর অভ্যাস সৃষ্টি করে দেয়া হয় যে, যতটুকুই সে তিলাওয়াত করে তা যেন বুঝে করে। একতো হলো নিত্য দিনের সকাল বেলার তিলাওয়াত। এমন তো হতে পারে যে, না বুঝেও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনাদের তাকে কুরআন করীম পড়াতেই হয়; কিন্তু সাথে সাথে এর অর্থ ও ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দেয়ার কর্মসূচীও প্রবহমান থাকা আবশ্যক। নামাযের বাধ্য-বাধকতা ও নামাযে যেসব স্বাদ রয়েছে ঐসব বাল্যকাল থেকেই শিখানো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো জামেয়ায় এসে শিখার বিষয় নয়। এর অনেক পূর্বে ঘরে বসে নিজেদের পিতামাতার তরবীয়তের অধীনে থেকে শিশুদের এগুলো সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষায় ব্যাপকতা সৃষ্টি করার গুরুত্ব

এতদ্ব্যতিরেকে শিক্ষায় ব্যাপকতা সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আর ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যাপকতা সৃষ্টির একটি পদ্ধতি এই যে, কেন্দ্রীয় পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কতক দেশ এমন যে, সেখানে পত্রিকা নেই। আর কতক ভাষা এমনই যাতে স্থানীয় পত্রিকাও নেই। কিন্তু এখনও আমাদের নিকট সময় আছে এবং বিগত কয়েক বছরে আল্লাহ্তাআলার আশিসে জামাতগুলোতে নিজ নিজ পত্রিকা প্রকাশ করার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। তাই সমস্ত জামাতের ব্যবস্থাপনাকে এ কথা দৃষ্টি-পটে রাখতে হবে যে, যখন আগামী ২/৩ বছরে এসব

শিশু বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করবে অথবা ধরুন ৪/৫ বছরের মধ্যে বুঝে নিবে ঐ সময়ে ওয়াকেফীনে নওদের জন্যে কতক স্থায়ী কর্মসূচী, কতক স্থায়ী ফিচার নিজেদের পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হতে থাকা আবশ্যক। যেমন, ওয়াকফে নও কী ? আমরা তাদের নিকটে কী প্রত্যাশা করে থাকি ? এতদ্ব্যতিরেকে সমন্বিতভাবে একবার এমন কর্মসূচী দিয়ে দেয়া হয় যা কিনা কিছু দিন পরে ভুলে যায়। এসব পত্র-পত্রিকা ছোট ছোট খন্ডাকারে তরবীয়তী কর্মসূচী উপস্থাপন করুক এবং যখন এক অংশ শিক্ষা করা হয়ে যায় তখন অন্যদিকে মনোযোগ দিতে হবে, পরে তৃতীয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উৎসর্গীকৃত শিশুদের জ্ঞানের ভিত্তি ব্যাপকতর হতে হবে। সাধারণভাবে ধর্মীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে এই দুর্বলতাই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যে, ধর্মের জ্ঞানের দিক থেকে তো তাদের জ্ঞান যথেষ্ট ব্যাপক, গভীরও হয়ে থাকে, কিন্তু ধর্মের সীমানার বাইরে অন্যান্য পার্থিব ক্ষেত্রসমূহে তারা একেবারেই অজ্ঞ হয়ে থাকেন। জ্ঞানের এ স্বল্পতার কারণে ইসলামকে বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ঐ যে অজুহাত যা কিনা ধর্মীয় ক্ষতির কারণে পরিণত হয় উহাদের মধ্য থেকে ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এজন্যে আহমদী জামাতকে এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

আর জ্ঞানকে ব্যাপক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় জ্ঞানকে প্রবৃদ্ধি দান করা আবশ্যক। অর্থাৎ সাধারণ ভিত্তিতে পার্থিব জ্ঞান ব্যাপকতর হোক আবার এর ওপরে ধর্মীয় জ্ঞানের সংযোজন ঘটলে খুবই সুন্দর ও কল্যাণমণ্ডিত এক পবিত্র বৃক্ষের জন্ম হতে পারে। তাই এ দিক থেকে শৈশবকালেই ঐসব ওয়াকেফীনে নও শিশুদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ানোর প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আপনারা স্বয়ং গভীর দৃষ্টি দিলে তাদের জ্ঞান আপনা-আপনি বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ পিতা-মাতা সুদৃষ্টি দিয়ে এবং শিশুদের জন্যে এমন সব পুস্তাদি, এমন পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা করুন, এমনসব পুস্তকাদি পাঠ করার জন্যে তাদের অভ্যাস গড়ে তুলন যার ফলশ্রুতিতে তাদের জ্ঞান ব্যাপক করা হয় এবং যখন তারা স্কুলে যায় তখন এমনসব বিষয়াদির নির্বাচন করে যদ্বারা বিজ্ঞানের বিষয়ও কিছু জানা হয়ে যায়। সাধারণ বিশ্বের কলা বিষয়ক যে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়াদি রয়েছে যেমন, দৈনন্দিন জীবন যাপন সম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক, দর্শন, মনস্তত্ত্ব বিষয়ক, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায়- বাণিজ্য প্রভৃতি এমন বিভিন্ন বিষয়াদি থেকে কিছু না কিছু জ্ঞান শিশুদের অবশ্যই থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতিরেকে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠানো আবশ্যক। কেননা, স্কুলে তো মানুষের এত বেশী সামর্থ্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ শিশু পাঁচটি বিষয়, ছয়টি বিষয়, সাতটি বিষয় নিয়ে নিবে। কেউবা ১০টি বিষয় নিয়ে নিবে। কিন্তু এথেকে বেশী পারে না। এজন্যে আবশ্যক যে, এমন শিশুদেরকে নিজস্ব পড়াশুনা ব্যতিরেকেও (অতিরিক্ত পুস্তকাদি) পাঠ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এখন এসব বিষয় এমন যে, আমাদের জীবন উৎসর্গকারী শিশুদের পিতা-মাতার মধ্য থেকে অধিকাংশেরই শক্তির বাইরে। আমি জানি অনেক

গোবেচারা এমন আফ্রিকায় হোক বা এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায়ও যাদের মধ্যে এ ক্ষমতা নেই যে, এ কর্মসূচীকে কার্যকরীভাবে নিজেদের সন্তানদের মধ্যে বাস্তবতা দান করতে পারেন। (এজন্যে এসব কথা যা এতক্ষণ বলা হলো তাহরীকে জাদীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ইহা নোট করে নেয়া উচিত আর এই খুতবার মধ্যে যেসব সূক্ষ্ম কথা-বার্তা বলা হলো ওগুলো আগামীতে জামাতের মধ্যে এমনভাবে পৌছানোর বন্দোবস্ত করতে হবে যেন পিতা-মাতার নিজেদের স্বল্প জ্ঞানের ও কম সামর্থ্য শিশুদের উন্নত শিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। সুতরাং কতক স্থানে এসব শিশুদের তরবীয়তের ব্যবস্থা জামাতকে প্রথম থেকেই সম্পন্ন করতে হবে। কতক স্থানে অঙ্গ-সংগঠনগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পরের কথা। এখনতো ঐসব কথা মনে আসছে, আমাদের কী প্রকারের ওয়াকেফীন শিশুর প্রয়োজন ওগুলো আপনাদেরকে আমি বুঝাচ্ছি।

আত্ম নিয়ন্ত্রিত রীতি-নীতি

এমনসব ওয়াকেফীন শিশুর প্রয়োজন, যাদের শুরু থেকে নিজেদের ক্রোধ দমনের অভ্যেস হয়ে যায়, যারা নিজের চেয়ে স্বল্পজ্ঞানের লোকদের হেয় দৃষ্টিতে দেখে না, যাদের এমন সাহস আছে যে, বিরোধাত্মক কথা-বার্তা শুনে অথচ সহ্য করার প্রমাণ দেয়। যখন তার নিকট কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয় তখন সহিষ্ণুতার ইহাও একটি প্রত্যাশা যে, সাথে সাথেই মুখ থেকে কোন কথা বের করে না বরং কিছু চিন্তা করে তারপর জবাব দেয়। এসব এমন কথা-বার্তা যা কিনা শৈশব কাল থেকেই স্বভাবে এবং অভ্যেস পরিণত করা উচিত। যদি শৈশব কাল থেকে এগুলো অভ্যেসে সুদৃঢ় না হয় তাহলে বড় হয়ে কখনও কখনও একজন মানুষ জ্ঞানের এক অতি উচ্চ মার্গে পৌছা সত্ত্বেও এসব সাধারণ ও সাদা-সিদা কথাগুলো থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, যখন কাউকে কোন প্রশ্ন করা হয় তখন বিষয়টি তার জানা থাকুক বা না থাকুক সাথে সাথেই জবাব দিয়ে দেয়া হয়। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে, একটি কথা জিজ্ঞেস করা হলো আর যাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে তো ইহা অবগত যে, ইহা হওয়ার ছিলো কিন্তু জানা নেই যে, আসলেই ইহা হয়ে গেছে– এতদ্‌সত্ত্বেও কখনও কখনও সে বলে দেয় যে, হ্যাঁ, উহা হয়ে গেছে। ওয়াকেফীনে জিন্দেগীর মধ্যে ইহা বড়ই অনিষ্ট সৃষ্টি করতে পারে। আমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতায় বহুবার ইহা দেখছি যে, এ ধরনের খবর থেকে কখনও কখনও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। যেমন, আমি লঙ্গর খানার নাযেম ও ব্যবস্থাপক থাকতাম। যখন ফোনে জানতে চাইলাম যে, এত হাজার রুটি তৈরী হয়েছে কি ? তখন জবাব পেতাম, জি হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এর ওপরে নিশ্চিত হতাম। যখন সেখানে পৌছতাম তখন জানতে পারতাম যে, এখনও কয়েক হাজার কম রয়ে গেছে। আমি বলি, আপনি এ কী বিপদে ফেল্লেন ? মিথ্যে বলেছেন, ভুল রিপোর্ট

করেছেন আর এতে খুবই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সে বলতে লাগলো, না না, যখন আমি কথা বলেছিলাম তার আধঘন্টা আগে এত রুটি তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। তাই আধঘন্টা পরে এত রুটি তো অবশ্যই তৈরী হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। এ কথার মূল্য ও যুক্তি তো ঠিক আছে। কিন্তু বাস্তব দুনিয়াতে এ ফরমূলা কার্যকরী নয়। সময়মত এক্ষেত্রে ইহা দৃষ্টি-পটে চলে আসলো যে, সেখানে কিছু ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। মজুরদের মধ্যে আপসে কোন ঝগড়া লেগে গিয়েছিলো, গ্যাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কয়েক প্রকার ত্রুটি এমন সৃষ্টি হয়ে যেতো। তাই সে আধ ঘন্টায় যে কয়েক হাজারের হিসাব কষেছিলো ঐ আধা ঘন্টায় কোন কাজই হয় নি। এ অভ্যেস অনেকের মধ্যেই আছে। আমি আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, বিশেষভাবে এশিয়ায় এ অভ্যেস অধিক পরিমাণে পরিদৃশ্য হয় যে, একটি বস্তুর অনুমান করে উহাকে বাস্তবাকারে বলে দেয়া হয়। আর জীবন উৎসর্গকারীগণের মধ্যেও এ অভ্যেস সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ ইতঃপূর্বে যেসব উৎসর্গকারী এসেছেন তাদের রিপোর্টের মধ্যেও কখনও কখনও এ ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে যার ফলে জামাতের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাই শৈশবকাল থেকেই এ অভ্যেস সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যে, যতটুকু জানা আছে ততটুকু জ্ঞানতঃ এবং যতটা আনুমানিক ততটা আনুমানিকভাবে বলে দেয়া। আর যদি শৈশব কাল থেকে এ অভ্যেস সৃষ্টি না করা হয় তাহলে বড় হলে পরে বেশী বয়সে ইহা অভ্যেসে পরিণত করানো খুবই কঠিন কাজ হয়ে থাকে। কেননা, এমন কথা-বার্তা মানুষ চিন্তা না করে বলে দেয়। অভ্যেসের অর্থই এই যে, সহসাই মুখ থেকে একটি কথা বের হয়ে যাওয়া। আর এই অসাবধানতা কখনও কখনও আবার মানুষকে মিথ্যার দিকেও নিয়ে যায় এবং খুবই বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে। কেননা, এমন লোকদের মধ্য থেকে অনেককে আমি এমন দেখেছি যে, যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি এমন কেন করলেন ? তখন তারা সোজাসুজি বলে দেয় যে, আমরা অনুমান করেছিলাম। তারা তাদের ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে প্রথম ভুলটি ঢাকবার জন্যে দ্বিতীয়বার কেবল মিথ্যা বলে দেয় এবং এমন কোন বাহানা অন্বেষণ করে যার কোন অর্থই হয় না। যখন এ বাহানাকে ধরা হয় তখন আবার আর একটি মিথ্যা কথা বলে ফেলে। লজ্জা-শরমের কথা স্বতন্ত্র–সারা দুনিয়া এর ওপরে হাসতে থাকে আর ঐ বেচারা মিথ্যের পর মিথ্যে বলে স্বীয় সম্মান রক্ষার চেষ্টা করে যেতে থাকে। এ অভ্যেস শৈশব কাল থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। ছোট ছোট শিশুকে যখন ঘরে ধরা হয় যে, আপনি ইহা বলেছেন, কিন্তু উহা হয় নি। ঐ সময়ে সে উপরোক্ত এমন ভাবই দেখাতে থাকে। কিন্তু পিতা-মাতা এগুলো গ্রাহ্য করেন না। ফলতঃ মেজায নষ্ট হয়ে যায় আর কখনও কখনও এমনভাবে বিগড়ে যায় যে, ঠিক হতেই পারে না। অভ্যেসবশতঃ সে এ রকম কাজ আরম্ভ করে দেয়। অর্থাৎ সরাসরি মিথ্যে হয় না তবে অভ্যেস হয়ে যায় যে, অনুমান বা আন্দাজ করে সত্য বানিয়ে উপস্থাপন করে দেয়া হয়। তাই এমন উৎসর্গকারী যদি জামেয়াতে এসে যায় তাহলে জামেয়াতে

খোদাতাআলার আশিসক্রমে ঐতিহাসিক ওয়াকফে নও তাহরীকে ১২শ' এরও অধিক শিশুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। (বর্তমানে ইহা প্রায় ১৯ হাজার হয়েছে-অনুবাদক) আমার প্রত্যাশা ছিলো যে, আমরা কমপক্ষে ওয়াক্‌ফে নও হিসেবে ৫ হাজার শিশুকে খোদার সমীপে উৎসর্গ করি।

স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণকারী অনেক পিতা-মাতার অনুরোধে তাহ্‌রীকে ওয়াকফে নও-এর সময়সীমা আপাততঃ দু'বছর বৃদ্ধি করা হলো। ওয়াকফে নও সন্তানদের পিতা-মাতার ওপরে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্বাবলী অর্পিত হয়।

তাদের এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক যে, তারা আগামী শতাব্দীতে মহান নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করে।

বেচারার নিম্নস্থ লোকেরা কখনও অবিশ্বস্ততার কাজ করে ফেলে অথচ পরে অভিযোগ তার ওপরে আরোপিত হয়। আর কখনও নিরীক্ষণের ফলে সে অব্যহিত লাভ করে। কখনও কখনও বিষয়টি জটিলই থেকে যায়। পরে সর্বদা দ্ব্যর্থবোধক পরিস্থিতি বাকী থেকে যায় যে, ইহা জানাই যায় না যে, আসলে সে অবিশ্বস্ততার কাজ করেছে কি করে নি। তাই প্রারম্ভ থেকে ওয়াকফে নও শিশুদেরকে হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এজন্যেই আমি হিসাব-কিতাবের উল্লেখ করেছিলাম যে, তারা যেন ভালভাবে হিসাব করতে জানে এবং তাদেরকে শৈশব কাল থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার যে, কীভাবে ধন-সম্পদের হিসাব রাখা হয়। দৈনন্দিন কেনা-কাটার মাধ্যমেই তাদের এই প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। আবার যদি তাদের দ্বারাই কেনা-কাটা করানো হয় তাহলে তাদের মাধ্যমে বিশ্বস্ততার মাধুর্য অধিকতর দেখানো যায়। যেমন কতক শিশু দ্বারা পিতা-মাতা কেনা-কাটা করিয়ে থাকেন। কিন্তু অবশিষ্ট থাকলে তা পকেটে রেখে দেয়। অবিশ্বস্ততা করে নয়। তাদের মা-বাবার অর্থ। আর তারা ইহা মনে করে যে, এ আবার কি ফেরৎ দেবো। ঐ সময়েই প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। এ সময়ে তাকে বলা উচিত যে, কেনা-কাটার পরে যদি একটি আধলা বা একটি পয়সাও অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা ফেরৎ দেয়া উচিত। পরে আধলার পরিবর্তে ১০ টাকাই চাও না কেন তাতে দোষ নেই। কিন্তু না বলে যে আধলাটা পকেটে পুরা হয়, এই মনে করে যে, ইহা বেঁচে গেছে ইহা আর কি ফেরৎ দেবো, এক্ষেত্রে সে অবিশ্বস্ততার বীজ বপন করে দিয়ে থাকে। ভবিষ্যতে অসাবধানতার বীজ বপন করা হয়ে থাকে। তাই যে জাতি খারাপ বা ভাল হয়ে যায় তা প্রকৃতপক্ষে ঘরেই খারাপ হয়ে থাকে বা ভাল হয়ে থাকে। পিতা-মাতা যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সন্তানদের তরবীয়ত করে থাকেন তাহলে তারা মহান ভবিষ্যতের অট্টালিকা নির্মাণ করে থাকেন অর্থাৎ তাদের ঘরে খুবই মর্যাদাবান জাতি গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসাবধানতা বিরাট বিরাট এবং কখনও কখনও মারাত্মক ফলাফল প্রকাশ করে যেতে থাকে। সুতরাং আর্থিক ব্যাপারে ওয়াকফে নও শিশুদেরকে তাকওয়ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথসমূহ শিক্ষা দিন। এসব কথা যা আমি বলে যাচ্ছি সকলের সাথে তাকওয়ারই সম্পর্ক। তাই তাকওয়ার কতিপয় মোটা মোটা কথা যা সাধারণ লোকদের জানা আছে। কিন্তু আরও কতিপয় সূক্ষ্ম পথ রয়েছে। ওয়াকেফীনদেরকে খুবই সূক্ষ্ম পন্থায় তাকওয়ার এ পথগুলো আমাদের শিখিয়ে দেয়া আবশ্যক।

হোঁচট থেকে রক্ষা পাওয়ার কতক জরুরী সাবধানতা অবলম্বন

এতদ্ব্যতিরেকে ওয়াকফে নও শিশুদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস সৃষ্টি করানো, জামাতী ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য বাল্যকাল থেকেই করানো, আতফালুল আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ততা, নাসেরাতের সাথে সম্পৃক্ততা, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ততা করানোও খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব তো পরবর্তীকালে অর্পিত হয়। কিন্তু ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত–খোদ্দামের বয়স-সীমা পর্যন্ত তো আপনারা তরবীয়ত করতে পারেন। খোদ্দামের বয়স-সীমা

পর্যন্ত যদি তরবীয়ত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে পরে আনসারের বয়সের সময় খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কালে ভদ্রে ঘটতে পারে, নচেৎ যতই দীর্ঘ নলের মধ্য দিয়ে গুলি চালানো যায় ততই দূর পর্যন্ত উহা সরল পথে চলে। খোদ্দামের বয়সের সীমা পর্যন্ত যদি তরবীয়তের নল দীর্ঘ হয়ে যায় তাহলে খোদাতাআলার আশিসক্রমে (যদি আল্লাহ্ অন্য রকম না চান) ঐ লোক আমৃত্যু সরল পথেই চলবে। তাই এদিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, নেযাম ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিখানো হোক। আবার **নিজেদের ঘরে এমন কথা-বার্তা কখনও বলা উচিত নয় যদ্বারা জামাতী ব্যবস্থাপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা কর্ম-কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ঐ অভিযোগ যদি যথার্থও হয় তাহলে পরেও যদি আপনি নিজের ঘরে একথা বলেন তবে আপনার সন্তান সব সময়ের জন্যে এতদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। আপনিতো অভিযোগ করার পরও আপনার ঈমানের হেফাযত করতে সক্ষম কিন্তু আপনার সন্তান অধিকতর গভীরভাবে আঘাত অনুভব করবে। এ আঘাত এমনই হয়ে থাকে যে, যার লাগে তার কমই লাগে, যে নিকেট বসে দেখে তার বেশী লেগে থাকে। এ জন্যে অধিকাংশ ঐসব লোক যারা জামাতের ব্যবস্থাপনার ওপরে মন্তব্য করার সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করে না তাদের সন্তানগণ কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর কতক চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়।** ওয়াক্‌ফে নও শিশুদের না কেবল এদিক থেকে বলাই যথেষ্ট বরং ইহাও বুঝানো উচিত যে, যদি কারও ব্যাপারে তোমার কোন অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে তার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা যতই মহৎ হোক না কেন এর ফলে তোমাদের সত্তাকে ধ্বংস করা উচিত নয়। যদি কেউ জামাতের আমীর হন আর তার কাছে সবারই আশা যে, তিনি ইহা করবেন উহা করবেন এবং কোন আশার কারণে কেউ যদি হোঁচট খায় তাহলে জীবন উৎসর্গকারীগণের জন্যে ইহা খুবই আবশ্যকীয় যেন তাকে বিশেষভাবে ইহা বুঝানো হয় যে, এ হোঁচট খাওয়ার ফলশ্রুতিতে তোমার ধ্বংস হওয়া উচিত নয়। ইহাও একপ্রকার আঘাত প্রদানকারী কথা। আমি এর উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ আসলে হোঁচট তো খেয়েছে কোন কর্মকর্তা এবং যে দেখেছে সে নিজের কবর রচনা করেছে। আর সে (কর্মকর্তা) হোঁচট খেয়ে আবারও ধর্মের হেফাযত করে নেয়। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্যে মানুষ ইস্তিগফার করে এবং শামলিয়ে নেয়। তারা অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায় না কেবল মাত্র তার বিশেষ কতক ভুল-ত্রুটি ব্যতিরেকে। কিন্তু যার স্বভাবে হোঁচট খাওয়ার উপকরণ নিহিত সে এসব ভুল-ত্রুটি দেখে কখনও ধ্বংসই হয়ে গিয়ে থাকে। ধর্ম থেকেই ঘৃণাপরায়ণ হয়ে গিয়ে থাকে আর পরে বিষ ছড়ানোর কাজের উৎসে পরিণত হয়। সভা-সমিতিতে বসে যেখানে বন্ধুদের মাঝে কথোপকথন হতে থাকে, সেখানে বলতে থাকে, আরে ! অমুক ব্যক্তি তো ইহা করেছিলো, অমুক ব্যক্তি তো উহা করেছিলো। আর এভাবে তারা গোটা জাতির ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। তাই শিশুদের প্রথমে এ বিপর্যয় থেকে তো রক্ষা

করুন! পরে যখন কিছু বয়স বাড়বে তখন তাদেরকে বুঝান যে, আসল ভালবাসা তো খোদা ও তাঁর ধর্মের সাথে। এমন কোন কথা বলা উচিত নয় যদ্বারা আল্লাহ্‌র জামাতের ক্ষতি সাধিত হয়। যদি ব্যক্তিগতভাবে কারও নিকট থেকে আপনি দুঃখ পেয়ে থাকেন তাহলে এর অবশ্যই এই ফল বেরোয় না যে, আপনার অধিকার জন্মায় যে, আপনার পরিবেশে নিজের বন্ধুদের নিজের সন্তান-সন্ততিদের ধর্ম-বিশ্বাসকে আপনি ক্ষত-বিক্ষত করা আরম্ভ করেন। আপনার এ আঘাত আপনি সাহসিকতার সাথে আপনার মধ্যে রাখুন আর উহাকে নিরাময়ের জন্যে যে উপকরণ রীতিমত আল্লাহ্‌তাআলা সরবরাহ করেছেন উহাকে অবলম্বন করুন। কিন্তু লোকদের মাঝে এমন সব কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

আগামী শতাব্দীতে মহান নেতৃত্ব দেবার যোগ্য তরবীয়ত

আজও জামাতে এসব হচ্ছে এবং এমন সব ঘটনা আমার দৃষ্টি গোচরে রয়েছে যেমন, এক ব্যক্তি কোন কষ্ট পেলো। আর সে কতক নিষ্ঠাবানদের মাঝে একথা বলে দিলো। যদিও ঐ কথা সত্য ছিলো কিন্তু সে ইহা মনে করলো না যে, এসব নিষ্ঠাবানদের ঈমানের কত বড় ক্ষতি সাধিত হতে পারে। কতক জীবন উৎসর্গকারী এ ধরনের চাল-চলন দেখিয়েছেন। তাদের ব্যবস্থাপনা বা তবশীরের (অফিসের) ওপরে অভিযোগ আছে। অন্য দেশের নতুন আহমদী। বেচারারা নিষ্ঠাবান। সারাজীবন বড়ই নিষ্ঠোর অবস্থায় জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখতে ছিলেন। তাদেরকে সহানুভূতি আকর্ষণের জন্যে এ কথা বলা যে, দেখ, আমার সাথে এই ব্যবহার করা হয়েছে। সে রং ঢং মেখে ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করে দিলো। স্বয়ং তো এভাবে বেঁচে গিয়ে নিজ দিকে প্রত্যাবর্তন করলো আর পিছনে কয়েকটি আক্রান্ত আত্মা ছেড়ে গেলো। তাদের পাপ কার মাথায় বর্তাবে ? তখন পর্যন্ত ইহাও সিদ্ধান্ত হয়নি যে, ব্যবস্থাপনারও কি ত্রুটি ছিলো না অন্য কিছু। আর যে পর্যন্ত আমি তদন্ত করেছি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ছিলো না। কু-ধারণা থেকে সমস্ত বিষয়টি আরম্ভ হয়েছিলো। আর যদি ত্রুটি হয়ে গিয়েও থাকে তাহলেও কারও এ অধিকার ছিলো না, নিজের কষ্টের কারণে অন্যের ঈমান বিনষ্ট করে। অতএব সত্যিকারের বিশ্বস্ত সে-ই হয়ে থাকে, যে খোদাতাআলার জামাতের দিকে দৃষ্টি রাখে। উহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে। ভালবাসার ঐ প্রমাণই সঠিক যা হযরত সুলায়মান আলায়হেস সালাম প্রস্তাব করেছিলেন। আর এথেকে নির্ভরযোগ্য কথা আর নেই। আপনারা শুনেছেন। অনেকবার আমার নিকট থেকে শুনেছেন। আগেও শুনতে ছিলেন। একবার হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারের দু'জন মাতৃত্বের দাবীদার মহিলার মামলা উপস্থাপন করা হলো। তাদের নিকট একটিই শিশু ছিলো। কখনও একজন হেচ্‌কা টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। কখনও অপরজন হেচ্‌কা টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। উভয়েই কাঁদছিলো আর চিৎকার করছিল যে, এটি আমার সন্তান। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও ধারণায় আসলো না যে, এ সমস্যা কীভাবে সমাধান হতে পারে। সুতরাং হযরত সুলায়মান আলায়হেস সালামের

দরবারে এ মোকদ্দমা পেশ করা হলো– তখন তিনি (আঃ) বল্লেন, ইহা ঠিক করা তো বড়ই কঠিন যে, ইহা কার সন্তান। যদি একজনের সন্তান হয় আর অন্য জনকে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে খুবই অন্যায় করা হবে। এজন্যে কেন এ শিশুকে দু'টুকরো করে দেয়া হয় না এবং এক টুকরো একজনকে আর অন্য টুকরো অপর জনকে দিয়ে দেয়া হয় যেন অবিচার না হয়। সুতরাং তিনি জল্লাদকে বল্লেন, আস, এ শিশুটিকে ঠিক মধ্যখান দিয়ে দু'টো টুকরো করে একটি একজনকে অপরটি অন্যজনকে দিয়ে দাও। যে আসল মা ছিলো সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সন্তানের ওপরে আর বলতে লাগলো, আমাকে টুকরো করে ফেলো আর শিশুটি তাকে দিয়ে দাও। খোদার দোহাই এ শিশুটির যেন কোন ক্ষতি না হয়। তখন হযরত সুলায়মান আলায়হেস সালাম বল্লেন, এ শিশুটি এর। অতএব যে **খোদার খাতিরে জামাতের সাথে ভালবাসা রাখে তার পক্ষে ইহা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, জামাতকে খন্ড-বিখন্ড হতে দেয় ? আর এমন সব কথা সহ্য করে, যেগুলোর ফলশ্রুতিতে কারও ঈমানের ক্ষতি সাধিত হয় ? সে নিজের ওপরে সব দুঃখ-কষ্ট বরদাশ্‌ত করে নেবে আর ইহাই তার সত্যতার নিদর্শন। কিন্তু স্বীয় দুঃখ-কষ্ট দ্বারা অন্যের আত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে না।** অতএব উৎসর্গকারীগণের মধ্যে অসাধারণভাবে এ রকম প্রশিক্ষণের আবশ্যক। কেননা, ইহা এক বারের ঘটনা নয়। দু'বার হয় নি। আগে বহুবার হয়ে গেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে কখন কখনও বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এক ব্যক্তি মনে করলো, আমি খুবই চালাকি করেছি। খুবই প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। এভাবে তাহরীকে জাদীদ আমার সাথে করেছে আর এভাবে আমি এর জবাব দিয়েছি। এখন দেখে নাও আমার পেছনে কত বড় একটি দল। আর ইনি চিন্তা করলেন না যে, দল তার পিছনে ছিলো না, ছিলো শয়তানের পিছনে। সে মুত্তাকীগণের নেতা হওয়ার পরিবর্তে মুনাফিক ও কপটদের নেতায় পরিণত হলো। আর স্বয়ং নিজের ক্ষতি সাধন করেছে এবং তার পিছনে অসাবধানকারীদের ধ্বংস করেছে। সুতরাং এই ছোট ছোট কথা যদিও মুখরোচক কিন্তু অসাধারণ ফলাফল সৃষ্টিকারী। আপনি বাল্যকাল থেকে আপনার ওয়াকফে নও শিশুকে এসব কথা বুঝান আর প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করুন যেন আগামী শতাব্দীতে তারা মহান নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করে।

ওয়াকফে নও শিশুদের মধ্যে বিশ্বস্ততার উপকরণ সৃষ্টি করুন

পরিশেষে অনেক কথার মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলতে চাই আর তা হলো এই যে, ওয়াকফে নও শিশুদেরকে বিশ্বস্ততার শিক্ষা দিন। বিশ্বস্ততার সাথে জীবনোৎসর্গের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঐ জীবনোৎসর্গকারী, যে বিশ্বস্ততার সাথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজের ওয়াকফের সাথে সংযুক্ত নয় সে যখন অব্যাহতি নেয় তখন জামাত তাকে শাস্তি দিক বা না দিক, সে তাঁর আত্মার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দাগ লাগিয়ে নেয়। আর ইহা বিরাট দাগ। এজন্যে

আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– নিজের শিশুদের উৎসর্গ করার এ সিদ্ধান্ত– একটি বিরাট সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে হয় এ শিশু মহান আওলিয়াতে পরিণত হবে, নচেৎ সাধারণ অবস্থা থেকেও পতিত হতে থাকবে। আর তার কঠিন ক্ষতি সাধিত হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। **উচ্চতা যত অধিক হবে সেখান থেকে পতিত হওয়ার ভয়াবহতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্যে খুবই সাবধানতার সাথে তাদের প্রশিক্ষণ দিন এবং তাদের বিশ্বস্ততার শিক্ষা দিন এবং বারে বারে শিক্ষা দিন।** কখনও কখনও এমনসব উৎসর্গকারী যারা উৎসর্গ থেকে অব্যাহতি নেয়, তারা নিজেরা চালাকী করে অব্যাহতি নেয় আর মনে করে যে, এখন আমরা জামাতের সীমা থেকে বাইরে এসেছি, এখন আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। এখন আমাদের কিছুই করতে পারবে না। এ চালাকী তো করা হয়, কিন্তু এটা বুদ্ধির কাজ নয়। সে চালাকী দ্বারা নিজের ধ্বংসকারীতে পরিণত হয়ে থাকে। কিছু সময় পূর্বে আমার সম্মুখে এমন এক জীবনোৎসর্গকারীর মামলা এসেছে যাকে এমন এক দেশে নিয়োগ করা হয়েছিলো যে, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকলে সেখানকার জাতীয়তা লাভ হতে পারতো। কতক কারণে তার বদলী আবশ্যক মনে করলাম। সুতরাং যখন আমি তাকে বদলী করলাম তখন ঐ সময় সীমার ৬ বা ৭ মাস বাকী ছিলো যার পরে তিনি নাগরিকত্ব লাভের যোগ্যতা লাভ করতেন। তাই তার পক্ষ থেকে বড়ই লাজুকভাবে এবং ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে পত্র আসা আরম্ভ হলো। আমাকে এখানে আর কিছু দিন বেশী সময় থাকার সুযোগ দেয়া হোক। আমি তাকে সময় দিয়ে দিলাম। কতক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা মনে করলেন যে, সে আমাকে বোকা বানিয়েছে। সুতরাং তারা লিখেন, জনাব এ তো আপনার সাথে চালাকী করেছে ! সে তো চায় যে, ওয়াকফ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এর পরে তার আর কোনই শঙ্কা থাকবে না। আমি তাদেরকে বল্লাম বা লিখলাম, আমার সব জানা আছে। আপনারা কি মনে করেন যে, সে কী জন্যে এরকম করছে তা আমার জানা নেই ? কিন্তু সে আমার সাথে চালাকী করছে না। নিজের আত্মার সাথে চালাকী করছে। সে ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে কুরআন করীমে বলা হয়েছে– **ইউখাদিউনাল্লাহা ওয়াল্লাযীনা আমানূ ওয়া মা ইয়াখদাউনা ইল্লা আনফুসাহুম** (তারা আল্লাহ্‌কে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায় অথচ তারা নিজেদের ব্যতিরেকে কাউকে ধোঁকা দেয় না - অনুবাদক) এজন্যে আমি তার সূতা ঢিল দিচ্ছি যেন আমার ধারণা ও আপনাদেরও ধারণা পাছে কুধারণায় পর্যবসিত করে না ফেলি। যদি সে এরকমই হয় যেভাবে আমি সন্দিহান সেক্ষেত্রে সে ওয়াকফের অধীনে থাকার যোগ্য নয়। কুধারণার বশবর্তী হয়ে অর্থাৎ এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যা কিনা কুধারণা হতে পারে তাকে আমরা বদলী করা ও তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তাকে সুযোগ দেয়া যথার্থ মনে করলাম। সুতরাং সে আশ্চার্যান্বিত হলো যে, আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম! আবার সে বল্লো, এত দিন সময় পাওয়া গেলে এত টাকাও আমার লাভ হবে। আমি বল্লাম, নিঃসন্দেহে তুমিও নাও। আর যখন সে ফিরে গেলো এর পরে তাই হলো যা হবার ছিলো।

কতক শিশু ঔদ্ধত্য করে থাকে এবং চালাকী করে থাকে। ইহা তাদের অভ্যেসে পরিণত হয়। তারা ধর্মের ব্যাপারেও ঔদ্ধত্য ও চালাকীর মাধ্যমে কাজ করতে থাকে আর এর ফলে কখনও কখনও এসব ঔদ্ধত্যপনার প্রকোপে স্বয়ং তার আত্মাকে বিনাশ করে দিয়ে থাকে। এজন্যে ওয়াকফের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্ববহ। ওয়াকেফীন শিশুদের ইহা বুঝান যে, **খোদার সাথে একটি অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আমরা বড়ই নিষ্ঠার সাথে করেছি। কিন্তু তুমি যদি এ কথা সহ্য করতে না পারো তাহলে তোমার জন্যে অনুমতি রয়েছে যে, তুমি ফিরে যেতে পারো।** একটি পর্যায়ে তখন আসবে যখন সে যৌবনের নিকটবর্তী সময়ে পৌঁছুবে। ঐ সময় জামাত তাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করবে যে, ওয়াকফের অধীনে থাকতে চাও কি চাও না ? একবার আমেরিকাতে ডিজনী ল্যান্ডে (Disney Land) যাওয়ার সুযোগ হলো। সেখানে এক Ride (নাগর দোলা জাতীয় খেলা) এমন ছিলো যাতে খুবই বেশী ভয়ানক বাঁক আসতো এবং উহার পরির্তনও ছিলো খুবই ক্ষিপ্রতর, আর হঠাৎ খুব ক্ষিপ্রতার সাথে বাঁক ঘুরতো, তাই দুর্বল হৃদয়ের লোকদের জন্যে ভয়ের কারণ ছিলো যে, হঠাৎ না তাদের হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তারা Warning (সতর্কতাসূচক) বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছিলো যে, এখনও ফিরে যেতে পারো, এখনও ফিরে যেতে পারো এবং আরও পরে লাল রং-এ লিখিত একটি সতর্কবাণী ছিলো– এখন ইহা শেষ ধাপ। এখন ফিরে যেতে পারো না। তাই জামাতে এমন একটি প্রবেশ দ্বার আসবে, যারা আজ ওয়াকফ্ করেছে এসব শিশুদের যখন জিজ্ঞেস করা হবে যে, এখন এই শেষ দরজা, এর পরে তোমরা ফিরে যেতে পারবে না। যদি জীবনের বেচা-কেনা করার সাহস থাকে, যদি একথা বলার সৌভাগ্য হয় যে, নিজের সবকিছু খোদার সকাশে উপস্থাপন করে দাও এবং কখনও ফিরিয়ে নেবে না তাহলে তোমরা সম্মুখে এগিয়ে এসো, নচেৎ তোমরা পেছনে ফিরে যেতে পারো। তাই এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে তাদের তৈরী করুন। **ওয়াকফ বা উৎসর্গ উহাই যার ওপরে মানুষ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সব প্রকার আঘাত সত্ত্বেও মানুষ হেঁচড়িয়ে হলেও এ রাস্তায় অগ্রসর হতে থাকে। পিছনে ফিরে যায় না।** এমন ওয়াকফের জন্যে আপনি ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রস্তুত করুন। আল্লাহ্তাআলা আপনাদের সাথী হোন।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সৌভাগ্য দিন যেন আমরা ওয়াকেফীনদের এমন এক বাহিনী খোদার পথে উপস্থাপন করি যা সর্বপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়, যেগুলো জেহাদ করার জন্যে আবশ্যকীয় হয়ে থাকে আর যেগুলোর ওপরে তাদের পরিপূর্ণ দক্ষতা থাকে।

[১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা]

ওয়াক্‌ফে নও নব প্রজন্মের
প্রস্তুতির ব্যাপারে
কিছু উপদেশ

তিন

বিষয় নির্দেশিকা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ওয়াকেফীনে নও শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা	৫৫
২।	তাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর করুন	৫৬
৩।	নোংরা সাহিত্যাদি থেকে তাদের দূরে রাখুন	৫৬
৪।	আপনার শিশুকে আপনারা যা কিছু পাঠ করান সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন	৫৮
৫।	আরবী ভাষার ওপরে সবচে' অধিক জোর দিন	৫৮
৬।	আরবী ভাষার পরে উর্দূও খুব গুরুত্ব বহন করে	৫৮
৭।	ভবিষ্যতে নিজেদের ওয়াকেফীনকে কমপক্ষে ৩টি ভাষায় পারদর্শী করুন	৫৯
৮।	শিশুদেরকে সদাচরণের অধিকারী করুন	৬০
৯।	তারা যেন লোকদের মন ভালবাসা দ্বারা জয় করে নেয়	৬০
১০।	আপনার অন্তরের বাসনা এই হওয়া উচিত যে, ওয়াকফে নও মেয়ে যেন ওয়াকফে নও ছেলের সাথে বিয়ে হয়	৬১
১১।	ওয়াক্‌ফে নও বালিকাদের শিক্ষকতা, ডাক্তারী, কম্পিউটার, টাইপিং ও ভাষাসমূহ শিক্ষা দিন।	৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পরে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি হল্যান্ড থেকে যে খুতবা দিচ্ছি তা আসলে আমার গত খুতবার পরিশিষ্ট বিশেষ। এ খুতবার কথা-বার্তা আমি ধীরে ধীরে বলবো। কেননা, এ খুতবা একই সাথে ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। আমার বিগত দিনের যতটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাথেকে আমি বলতে পারি যে, ডাচ্ ভাষায় অনুবাদকারী ইংরেজীতে তো খুবই ভাল এবং সরাসরি সরল অনুবাদ করে থাকেন কিন্তু ডাচ্ ভাষায় পান্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষিপ্রতার সাথে সরাসরি অনুবাদ করার সামর্থ্য এখন আমাদের মুবাল্লিগদের মধ্যে নেই অর্থাৎ উর্দূ থেকে সরাসরি (ডাচ্ ভাষায়) অনুবাদ করার। এজন্যে বাক্যও ছোট বলতে হবে যেন বিষয়-বস্তুর কোন অংশ বাদ পড়ে না যায়। আমি বিগত খুতবায় ওয়াকেফীনে নওদের নব-প্রজন্মের প্রস্তুতির প্রসঙ্গে কিছু উপদেশ দিয়েছিলাম অর্থাৎ ওয়াকেফীনদের বর্তমান প্রজন্মের প্রস্তুতির ব্যাপারে, যাদেরকে আগামী শতাব্দীতে উপঢৌকন হিসেবে আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে খোদার হুযূরে উপস্থাপন করা যাচ্ছে। যেহেতু এ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বিগত খুতবায় বর্ণনা করা যায় নি, কতক অংশ রয়ে গিয়েছিলো এবং কতক আরও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী ছিলো এজন্যে আজ সংক্ষেপে আমি এ বিষয়-বস্তু বর্ণনা করবো। **ওয়াকেফীনদের গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।** ঐ ওয়াকেফীন যারা ব্যাধির শিকার হয়ে থাকে, যদিও তাদের মধ্যে কতক খোদাতাআলা-প্রদত্ত সৌভাগ্যের কারণে অসাধারণ সেবাও উপস্থাপন করতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান ওয়াকেফীন রোগগ্রস্ত ওয়াকেফীনের তুলনায় অধিক সেবা করার যোগ্য প্রমাণিত হয়ে থাকে। **এজন্যে বাল্যকাল থেকেই তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি খুব সাবধানতার সাথে দৃষ্টি রাখা জরুরী।** আবার তাদেরকে বিভিন্ন খেলা-ধূলায় সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রীতিমত চেষ্টা করা উচিত। খেলাধূলার ব্যাপারে এক ব্যক্তির পসন্দ এক এক রকম হয়ে থাকে। সুতরাং যে খেলার প্রতি যে ওয়াকফে নও শিশুর অনুরক্তি দেখা যায় ঐ খেলায় আশানুরূপ সফলতার জন্যে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। কখনও এমন এক মুরব্বী যিনি কোন খেলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে থাকেন, কেবল এ খেলার সুবাদে তিনি লোকদের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপ্রত্তি সৃষ্টি করে নেন। আর যুব-সম্প্রদায় তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের তরবীয়ত ও

প্রশিক্ষণের যে কোন পথ অবলম্বন করা দরকার। কেননা, আমাদের নিয়্যত নিষ্ঠাপূর্ণ। এজন্যে এ রাস্তা খোদার দিকেই যাবে। পার্থিব জ্ঞানের ব্যাপারে আমি বলেছিলাম যে, তাদের শিক্ষার পরিধি ব্যাপকতর করা দরকার। তাদের জ্ঞানের পরিধিও ব্যাপকতর করা দরকার। এ প্রসঙ্গে জাতির ইতিহাস, ও বিভিন্ন দেশের ভূগোল বিশেষভাবে তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে শিশুর শৈশবের স্বভাবগত ঝোঁককে অবশ্যই দৃষ্টি-পটে রাখা দরকার। আর শিক্ষার ব্যাপারে এমন গাম্ভীর্য অবলম্বন করা উচিত নয় যদ্বারা ঐ শিশু হয় একেবারেই শিক্ষার প্রতি উদাসীন হয়ে যায় বা অন্যান্য শিশু থেকে নিজেকে একেবারেই অন্য কিছু মনে করে বসে এবং অন্যান্য শিশুর সাথে তার স্বভাবগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন, শিশুরা কিস্‌সা-কাহিনীও পসন্দ করে। এক বয়সে পৌঁছে তাদেরকে উপন্যাস পাঠ করা থেকে দূরে রাখা উচিত নয়। কিন্তু কতক ধরনের কাহিনী যা কিনা মানবীয় স্বভাবের ওপরে নোংরা ও গভীর খারাপ প্রভাবসমূহ ফেলে যায়, এথেকে তাদেরকে রক্ষা করা উচিত। হোক না দৃষ্টান্তস্বরূপ এক আধটি কাহিনী তাদের পড়তেও দেয়া উচিত। কতক শিশু Detective stories অর্থাৎ গোয়েন্দা কাহিনীতে খুবই স্বাদ পেয়ে থাকে। কিন্তু যদি তাদের এ ধরনের অযথা গোয়েন্দা কাহিনী পাঠ করানো হয়– যেভাবে আজকাল পাকিস্তানে খুবই প্রচলিত রয়েছে এবং কতক লেখক শিশুদের মধ্যে অসাধারণ সুনাম অর্জন করেছে। গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসেবে তো তাদের মেধা প্রখর হয়, তাদের যুক্তি প্রদানের শক্তিসমূহ তীক্ষ্ণ হয়ে যায় এবং পূর্বের চেয়ে অধিক যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা তাদের তেজদীপ্ত হয়, এতদ্ব্যতিরেকে তারা এমন মূর্খতাপূর্ণ গোয়েন্দা চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে যে, এর ফলশ্রুতিতে বুদ্ধি-ভ্রষ্ট করা ব্যতিরেকে আর কিছুই সাধিত হতে পারে না। সারা বিশ্বে শার্লক হোমসের যে অসাধারণ খ্যাতি লাভ হয়েছে তিনিও তো গোয়েন্দাগিরী নভেল লেখক ছিলেন। কিন্তু তার গোয়েন্দা কাহিনীসমূহ বিশ্বে এতগুলো ভাষায় অনূদিত হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন লেখকের এ ধরনের কাহিনী অন্য ভাষায় এত অনুবাদ করা হয় নি। যেভাবে সেক্সপিয়ারের নাম নিয়ে ইংরেজ জাতি গর্ব করে থাকে তেমনিভাবে এ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখককে নিয়েও ইংরেজ জাতি গর্ব করে থাকে। ইহা এজন্যে যে, তার যুক্তি-প্রমাণে যথার্থতা ছিলো, যদিও কাহিনী ছিলো অলীক। এজন্যে এ ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী শিশুদেরকে অবশ্যই পড়ানো উচিত, যদ্বারা যুক্তি-প্রমাণ দেয়ার শক্তিসমূহ প্রখর হয় কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনীগুলো তো যুক্তি-প্রমাণ দানের শক্তিসমূহকে পূর্বের চেয়ে প্রখর করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এভাবে হিন্দুস্থানে ও পাকিস্তানে আজকাল এ রীতি খুবই প্রচলিত আছে। আর উহা হলো শিশুদের দৈত্য-দানার কাহিনী পাঠ

করানোর রীতি। হিন্দুস্থানের দৈত্য-দানার কাহিনীগুলোতে এমন ধরনের চিন্তাধারা অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় যা কিনা শিশুদের ভূত ও যাদু-বিদ্যায় বিশ্বাস করায়। এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের মনের মধ্যে খচিত হয়ে যায়। যেমন সাপ, এক বয়স পর্যন্ত গিয়ে এমন যোগ্যতা অর্জন করে যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি জন্তুর রূপ ধারণ করে আর এভাবে যাদুগীর ও ডাইনীরূপে মানব জীবনের উপরে এক গভীর কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। এসব অলীক কাহিনী যদি বড়রা পড়ে তাহলে অবহিত হতে পারবে যে, এসব কেবল ছেলে-ভুল্লানো মনগড়া কাহিনী কিন্তু যখন শিশু পড়তে থাকে তখন সব সময়ের জন্যে তার মনে নানা প্রকার প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। শিশু একবার এসব কাহিনীর ডর পোকা বা ভীতুর ঢেলা হয়ে যায় এবং অন্ধকারকেও ভয় পায়, ঐসব বস্তু থেকেও ভয় পায়। পরে সারা জীবন তার এ দুর্বলতা দূরীভূত করা যেতে পারে না। কতক লোক শৈশবের ভীতি নিজের বুড়ো বয়স পর্যন্ত বহন করে থাকে। এজন্যে কাহিনীর মধ্যেও এমনসব কাহিনীকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক যদ্বারা কর্ম-নৈপুণ্যে মাহাত্ম্য, সত্যপ্রিয়তা ও সাহসিকতা সৃষ্টি হয়। অন্যান্য মানবীয় চরিত্রের মধ্য থেকে কতিপয় সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে– এমন সব কাহিনী তা পশুর ভাষায়ই বর্ণনা করা হোক না কেন, ক্ষতির বদলে কল্যাণপ্রদই হবে। আরবী ভাষার কাহিনী লেখকদের মধ্যে এ অনুরাগ দেখা যায় যে, তারা পশুর কাহিনীর আকারে অনেক চারিত্রিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। আলিফ লায়লা নামে দুনিয়ার বিখ্যাত যে কাহিনী রয়েছে, এতে যদিও নোংরা কাহিনীও রয়েছে, তবুও এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে কতক মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, **এক গল্প আছে যে, এক বাদশাহ্ স্বীয় রানীকে এক স্থানে একটি কুকুরের মত বেঁধে রেখেছিলেন। তার সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করা হতো। কুকুরকে খুবই সম্মানের সাথে সম্ভ্রান্ত মানুষের ন্যায় মহলের মধ্যে বসানো হয়েছিলো এবং উহার সেবার জন্যে চাকর-বাকর নিযুক্ত ছিলো। এ গল্প বাহ্যিকভাবে একেবারেই অলীক। কিন্তু যে উন্নত চরিত্রের কথা বলার উদ্দেশ্যে ছিলো তা হলো এই যে, কুকুর মালিকের বিশ্বস্ত ছিলো আর রানী ছিলো শঠ ও অকৃতজ্ঞ।** সুতরাং এ গল্প পড়ে শিশু কখনও এ শিক্ষা গ্রহণ করবে না যে, স্ত্রীর ওপরে নির্যাতন চালাতে হবে। বরং ইহা শিখবে যে, মানুষকে বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হতে হবে। এভাবেই মাওলানা-রুমীর মসনবীতে কতিপয় গল্প এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠ করে কতক লোক বুঝতেই পারে না যে, ইনি কেমন মাওলানা যিনি এত নোংরা গল্প স্বীয় মসনবীর মধ্যে লিখেছেন। এগুলো পাঠ করে মানুষ মনে করে যে, তার সকল দৃষ্টি যৌন বিষয়াবলীর প্রতি নিবদ্ধ। এর বাইরে তিনি চিন্তাই করতে পারেন না।

সুতরাং একবার লাহোরে একজন সম্মানিত গয়ের আহমদী রাজনীতিবিদ আমাকে মাওলানা রুমীর মসনবী দেখালেন যার মধ্যে স্থানে স্থানে চিহ্নিত করা ছিলো এবং সাথে সাথে একথা বল্লেন, আপনারা তো বলেন যে, ইঁনি বুযুর্গ মানুষ। তাঁর এত বড় মর্যাদা ছিলো। এত বিরাট দার্শনিক ছিলেন। এমন একজন সুফী ছিলেন। কিন্তু এসব ঘটনা আপনি পাঠ করুন আর আমাকে বলুন যে, কোন ভদ্র ব্যক্তি ইহা কি সহ্য করবে যে, তার স্ত্রী-কন্যা পুত্র-বধু এসব গল্প পাঠ করুক ? তাই আমি যখন এসব অংশগুলো বিশেষভাবে পাঠ করলাম তখন মনে হলো, এ বন্ধু মন্তব্য করতে ভুল করেছিলেন। এসব কাহিনী যদিও যৌন-বিজ্ঞানের সাথেই সম্পর্কিত কিন্তু উহার চূড়ান্ত ফলাফল এরূপ ছিলো যে, মানুষকে যৌন বিষয়ে বিপথগামিতার প্রতি কঠোর অনীহা সৃষ্টি করে দিতো এবং পরিণাম এমন ছিলো যদ্বারা যৌন আবেগ উছলিয়ে ওঠার পরিবর্তে মানুষের মন পবিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়তো। অতএব এখন বিস্তারিতভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কতিপয় উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। **আপনাদের শিশুকে আপনারা যা কিছু পড়িয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে ভালভাবে সতর্ক থাকুন যে, বাল্যকালে ত্রুটিপূর্ণ সাহিত্য পাঠ করালে উহার কুপ্রভাব কখনও মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সাথে আঁকড়ে থাকে এবং যদি সুসাহিত্যাদি পাঠ করানো হয় তাহলে উহার সুপ্রভাবও খুবই মর্যাদার সাথে সুফল বয়ে নিয়ে আসে আর কতক লোকের জীবন সুষমামন্ডিত করে দিয়ে থাকে।**

ভাষাসমূহের সাথে যতটা সম্পর্ক প্রাথমিক কাল থেকে আরবী ভাষার ওপরে সর্বাধিক জোর দেয়া উচিত। কেননা, একজন মুবাল্লিগ আরবীর গভীর জ্ঞান ব্যতিরেকে এবং উহার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তাৎপর্যসমূহ উপলব্ধি করা ব্যতিরেকে কুরআন করীম ও নবী (সঃ)-এর হাদীসগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারেন না। এজন্যে বাল্যকাল থেকেই আরবী ভাষার জন্যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। আর যেখানে উপকরণাদি সহজলভ্য সেখানে নিত্য দিনের কথা-বার্তারও প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। কাদিয়ান ও রাবওয়াতে আমাদের ছাত্রাবস্থায় যদিও আমরা আরবী ভাষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলাম কিন্তু দৈনন্দিন কথা-বার্তার ভঙ্গি শিখানো হয় নি অর্থাৎ মনোযোগের সাথে শিখানো হয় নি-এজন্যে উহারও একটি ক্ষতি পরে দৃশ্যমান হয়েছে। আজকাল যে রীতি অর্থাৎ কথোপকথন শিখানো হচ্ছে, কিন্তু ভাষার গভীর অর্থের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে না। এজন্যে অনেক আরববাসী এমন আছে এবং ব্যবসায়র উদ্দেশ্যে আরবী শিক্ষার্থীও এমন আছে যারা বলা তো শিখে নিয়েছে কিন্তু আরবীর গভীরতা থেকে অজ্ঞ ও উহার ব্যাকরণের ওপরে তাদের দখল নেই। সুতরাং নিজেদের ওয়াকেফীন প্রজন্মকে এ দু'টো বিষয়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা দিন। **আরবীর পরে উর্দূ ভাষাও**

খুবই গুরুত্ব বহন করে। কেননা, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ দাসত্বে এ যুগের যে ইমাম নির্বাচিত করা হয়েছে তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য উর্দূ ভাষায় রচিত। আহমদীয়া সাহিত্য যেহেতু বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা তাই আরব শিক্ষার্থীরাও যখন তাঁর (আঃ) আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তখন আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় যে, কুরআন এবং হাদীসে এমন গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান ঐসব লোক লাভ করে থাকে যা তাদের ধ্যান-ধারণায়ও আসতে পারে না, যদিও তারা মাতৃভাষা হিসেবে আরবী ভাষা শিখে এবং বলে। সুতরাং আমাদের আরবী সাময়িকী আত্ তাকওয়াতে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যেসব উদ্ধৃতি ছাপা হয় ওগুলো পাঠ করে কতক গয়ের আহমদী আরবী আলেমের এমন মর্যাদাপূর্ণ সুন্দর চিঠি-পত্র আসে যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। তাদের কতক মুফতীদের পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত। এমন মহান ব্যক্তিদের পুত্ররা যারা ধর্মের পণ্ডিত ছিলেন, তারা ধর্ম জগতে প্রসিদ্ধ মুফতী। তাদের নাম বলা সমীচীন মনে করি না। কিন্তু তারা আমাকে পত্র লিখেছে যে, আমরা তো ইহা দেখে বিস্মিত হয়েছি, আর কতক আরব বলেছে যে, এমন সুন্দর ভাষা এমন হৃদয়গ্রাহী আরবী ভাষা হযরত মসীহ্ মাওউদ-এর ! এক ব্যক্তি বলেছেন, আমি আরবী সাহিত্যে খুবই উৎসাহ বোধ করে থাকি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোন আরবকে এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাষা লিখতে দেখি নি। সুতরাং **আরবীর সাথে সাথে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দূ সাহিত্য পাঠ করানোও আবশ্যকীয় আর শিশুদের এমন উন্নতমানের উর্দূ শিখানো আবশ্যক যেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দূ সাহিত্য থেকে সরাসরি উপকৃত হতে শিখে।** পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাথে যতটা সম্পর্ক খোদাতাআলার ফযলে এখন বিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দেশে এমন আহমদী প্রজন্ম তৈরী হচ্ছে যারা স্থানীয় ভাষায় খুবই পারদর্শী। ঐ ভাষা-ভাষী লোকদের ন্যায় বলে। আর এখানে হল্যান্ডে এমন শিশুর অভাব নেই যারা বাইরে থেকে আসা সত্ত্বেও হল্যান্ডের ভাষা হল্যান্ডের ভাষা-ভাষীর ন্যায় খুবই সহজে ও স্বচ্ছতার সাথে বলে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের উর্দূ ভাষার মান এত উচ্চে নয়। সুতরাং কতক শিশুকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন জানতে পারলাম যে, হল্যান্ডের ভাষায়তো খুবই উন্নতি করেছে; কিন্তু উর্দূ ভাষা শিক্ষার প্রতি তেমন বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় নি অর্থাৎ ও ভাষায় তাদের দখল নেই। সুতরাং **ভবিষ্যতে নিজেদের ওয়াকেফীন প্রজন্মকে কমপক্ষে ৩টি ভাষায় পারদর্শী করতে হবে। আরবী, উর্দূ এবং স্থানীয় ভাষা।** তাহলে পরে ইনশাআল্লাহ্ আগামী শতাব্দীর জন্যে অধিকাংশ দেশে আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করার জন্যে খুব ভাল ভাল মুবাল্লিগ সরবরাহ করা হবে। ভবিষ্যতে জামাতী প্রয়োজন হলো কতক মানবীয় শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনাদি, যেসব ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি আর এখন এগুলোর ওপরে পুনরায় জোর দিতে চাচ্ছি। অতএব **ওয়াকেফীন শিশুদের সদাচরণের প্রতি**

সুবিশেষ দৃষ্টি প্রদান আবশ্যক। তাদেরকে সদাচরণের অধিকারী বানানো দরকার। 'আখলাক' শব্দের একটি দিক যা অধিক গভীরতার সাথে মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে কয়েকবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা কিনা সাধারণ অর্থে মানুষের সাথে মিলে-মিশে থাকার যোগ্যতাকে বলা হয়ে থাকে। এতদ্দ্বারা শত্রু কম হয়ে থাকে আর বন্ধু বেশী হয়ে থাকে। **কোন কর্কশ-ভাষী মানুষ উত্তম জীবন উৎসর্গকারীতে পরিণত হতে পারে না। আর কোন নিরস লোককে মোল্লা তো বলা যেতে পারে কিন্তু সে সঠিক অর্থে আধ্যাত্মিক মানুষে পরিণত হতে পারে না।** একবার একজন জীবন উৎসর্গকারীর ব্যাপারে এক স্থান থেকে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, সে সদাচরণের অধিকারী নয় এবং লোকদের সাথে অভদ্র আচরণ করে থাকে। যখন আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি তখন সে এই উত্তর দিয়েছে যে, সব মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। আমি তো একেবারেই সঠিক ভাবেই আছি-ভালভাবে চলছি। তাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি রয়েছে। যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করি তখন তারা রাগান্বিত হয়। আমি তখন তাকে বল্লাম, দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে তো সবচে' অধিক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যতটা দূরত্ব ঐ সময়ের লোকের সাথে তাঁর (সঃ) ছিলো উহার হাজার ভাগের একভাগও জামাতে আহমদীয়ার যুবকগণের সাথে আপনার নেই। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণরূপে নিষ্পাপ ছিলেন আর আপনারা নিজেদের ভিতরে কিছু দোষ-ত্রুটি স্বয়ং বহন করেন। হুযূর (সঃ) যাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তারা সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটিতে নিমজ্জিত ছিলো কিন্তু এসব যুবক তো কতক দিক থেকে বিবেকবান এবং বাইরের দুনিয়ার যুবকদের থেকে শত গুণে শ্রেয়। আপনি যখন উপদেশ দেন তখন তারা মন্দ বলে এবং ঘৃণাপরায়ণ হয়ে থাকে এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন উপদেশ দিতেন তখন তারা তাঁর (সঃ) প্রেমিকে পরিণত হয়ে যেতো। দ্বিতীয়তঃ আমি তাকে বল্লাম যে, এক আধটা অভিযোগ তো প্রত্যেক মুবাল্লিগের ব্যাপারেই হয়ে থাকে, যারা কোন কাজের জন্যে আদিষ্ট তাদের ব্যাপারেও এসে থাকে। প্রত্যেক লোককে তারা সন্তুষ্ট করতে পারেন না। কিছু লোক অবশ্যই অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এক ব্যক্তির ওপরে যদি আপত্তির ঢের পড়ে যায় তাহলে পরে গালিবের এ পঙক্তি প্রয়োজ্য হয় ঃ

সখতি সহী কালাম মেঁ লেকিন না ইস কদর
কী জিস সে বাত উসনে শেকায়াত যরূর কী

সত্য কথায় কর্কশতা থাকতে পারে কিন্তু অতটা নয়।
কিন্তু যার সাথে কথা বলা হয় সে-ই নালিশ করে।

সুতরাং নিজেদের সন্তানদেরকে এ অর্থে সদাচারী করে গড়ে তুলুন যেন মিষ্টি কথা বলতে পারে। লোকদের মন ভালবাসা দ্বারা জয় করে নেয়।

অপরিচিত ও শত্রুদের মনেও স্থান করে নিতে পারে। উন্নত সমাজে অনুপ্রবেশ করতে পারে। কেননা, এতদ্ব্যতিরেকে তবলীয়তও হতে পারে না আর তবলীগও অসম্ভব। কতক মুবাল্লিগকে আল্লাহ্‌তাআলা এই যোগ্যতা দিয়েছেন। এজন্যে স্বীয় দেশের বড় বড় লোকদের সাথে যখন তারা সাক্ষাৎ করেন তখন অল্প সময়ের সাক্ষাতে তারা তাদের আপন লোকে পরিণত হয়ে যায়। আর এর ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলার আশিসক্রমে তবলীগের মহান অর্গল উন্মোচিত হয়।

বালিকাদের সাথে যতটা সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে পিতা-মাতা অনেক বার প্রশ্ন করে থাকেন যে, আমরা তাদেরকে কেমন করে গড়বো ? পুরুষদের বেলায় বা বালকদের বেলায় যা প্রযোজ্য তার সব কথা বলে দিয়েছি। ওগুলো এদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকেও তাদের ঘর-গেরস্তির উন্নত শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। তাদেরকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। কেননা, সেদিন বেশী দূরে নয় যে, ঐ ওয়াকেফীন বালিকারা ওয়াকেফীন বালকদের সাথে বিয়ে-সাদীও করবে। যখন আমি বলি যে, সেদিন দূরে নয়, এর অর্থ এই নয় যে, আপনার **অন্তরের বাসনা এই যে, এটাই হওয়া উচিত যে, ওয়াকেফীন বালিকাদের সাথে ওয়াকেফীন বালকদেরই বিয়ে-সাদী হবে নচেৎ অন্যদের সাথে জীবন কাটানো কষ্টদায়ক হবে** এবং মন-মানসিকতায় কখনও দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। একটি ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী বালিকার তার গয়ের ওয়াকফ (অউৎসর্গীকৃত) স্বামীর সাথে ধর্মের ব্যাপারে ছেলের কম আসক্তি থাকায় কষ্টে-সৃষ্টে জীবন কাটাতে হতে পারে যে, এবং ওয়াকেফীনের সাথে বিয়ের ফলশ্রুতিতে অন্য কতক সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। যদি সে বড় লোকের মেয়ে হয় আর তার লালন-পালন সম্ভ্রান্ত কায়দায় হয়ে থাকে আর উন্নতমানের জীবন যাপন পরিচালনাকারী হয়ে থাকে তখন প্রথম থেকেই মানসিকভাবে তাকে প্রস্তুত করা হয় যেন সে সাদা-সিদা, নিরস জীবন ও দুঃখ-কষ্টের জীবন সহ্য করতে পারে এবং এই আচরণ পদ্ধতি শিখানো হয় যে, স্বল্পেও মানুষ তুষ্ট হতে পারে এবং স্বল্পেও স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ জীবন কাটাতে পারে। অতএব এসব বালিকা যাদের বাল্যকাল থেকে চাহিদার বাড়াবাড়ির অভ্যেস হয়ে থাকে সে যখন ওয়াকফে জীন্দেগীর ঘরে যায় তখন তাদের জন্যও দোযখ সৃষ্টি করে এবং নিজের জন্যেও। চাহিদার মধ্যে স্বভাবতঃ কোন ত্রুটি নেই কিন্তু যদি চাহিদা সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহলে পরে হোক তা স্বামীর নিকট বা পিতা-মাতার নিকট অথবা বন্ধু-বান্ধবের নিকট সেক্ষেত্রে জীবনকে দুর্বিষহ করে দেয়। আল্লাহ্‌তাআলা এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে কতই না সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন! যেমন বলেছেন, **লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস'আহা**-খোদা কারও সামর্থ্যের বাইরে দাবী

পেশ করেন না-তাই বান্দাগণের কি অধিকার যে, সামর্থ্যের বাইরে দাবী করে বা চাহিদা পেশ করে ? **ওয়াকেফীনে জিন্দেগী পুরুষদের স্ত্রীদের জন্যে বা ওয়াকেফীনে জিন্দেগী কন্যাদের জন্যে ইহা আবশ্যক যে, এ রীতি শিক্ষা করে। কারও নিকট তার সাধ্যাতীত চাহিদা পেশ না করে এবং স্বল্পে তুষ্ট হয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা শিক্ষা করে।** এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলতে চাই যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ওয়াকেফীনদের তাহরীক করতে গিয়ে আরও একটি তাহরীক করেছিলেন যে, ধনী ঘরের শিশুদের জন্যে ঘরের অন্যান্য সব ব্যক্তিবর্গের এ কুরবানী করা উচিত, তার ওয়াকফের কারণে তার জন্যে বিশেষভাবে কিছু আর্থিক সুবিধাদির যোগান দেয় আর ইহা মনে করে যে, আমরা আর্থিক দিক থেকে তাকে যতটা অভাবমুক্ত করে দেবো ততই উত্তম রঙ্গে সে জাতির প্রতি দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে আদায় করতে পারবে। উপদেশের সম্পর্ক কেবল ধনী ঘরের জন্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দরিদ্র ঘরের প্রতিও প্রযোজ্য। প্রত্যেক ওয়াকফে জিন্দেগী ঘরকে অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে যাতে ওয়াকফে জিন্দেগী রয়েছে আজ থেকেই এই সিদ্ধান্ত করে নেয়া উচিত যে, খোদা আমাদের যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন আমরা ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত লোককে এথেকে নিম্ন মানে থাকতে দেবো না। অর্থাৎ জামাতের পক্ষ থেকে চাহিদা পেশ করার আগেই ভাই ও বোন বা মা-বাবা যদি জীবিত হন এবং সামর্থ্য রাখেন বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ মিলে এমন ব্যবস্থা নেন যেন ওয়াকফে জিন্দেগী শিশুর জীবনের মান নিজের ঘরের পরিবেশ থেকে নিম্নতর না থাকে। সুতরাং এমন সব শিশু যখন জীবন সংগ্রামে অংশ নেয় তখন কোন প্রকার Inferiority Complex (হীনমন্যতা)-এর শিকার হয় না বরং আমানত ও বিশ্বস্ততার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। **যতটা বালিকাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে বিশেষ সাবধাণতার সাথে শিক্ষা দেয়া আবশ্যক অর্থাৎ Education-এর Instruction (Bachelor Degree in Education) সম্ভবতঃ বলা হয়ে থাকে বা উহার নাম যা-ই হোক না কেন দাবী এই যে, তাদেরকে শিক্ষিকা বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়াও। তারা শিক্ষকতার পেশা হয় গ্রহণ করুক বা না করুক, তাদের জন্যে ইহা কল্যাণজনক হতে পারে।** এমনিভাবে লেডি ডাক্তারের ভূমিকা জামাতে অনেক বেশী রয়েছে। আবার কম্পিউটার স্পেশালিষ্টের প্রয়োজন। পুনরায় টাইপিষ্টের প্রয়োজন। আর মেয়েরা এসব কাজ পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা ব্যতিরেকে সাধন করতে পারে। কেবল ডাক্তারের কথা স্বতন্ত্র। বাকী সকল কাজ ভালভাবে সাধন করতে পারে। আবার তাদেরকে ভাষাবিদও বানোনো উচিত অর্থাৎ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, তাদেরকে শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত করে গড়ে তোলা উচিত যেন এ জামাতের পুস্তকাদি প্রণয়নের

ক্ষেত্রে তারা সেবা প্রদান করতে পারে। এভাবে আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যত ওয়াকেফীন প্রজন্মকে পৃষ্ঠপোষণ করি, তাদের প্রতিপালন করি, তাদের উত্তম ওয়াকেফ করে গড়ে তুলতে জামাতীভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে মিলে-মিশে চেষ্টা করি তাহলে আশা করি, আগামী শতাব্দীর ওপরে জামাতে আহমদীয়ার বর্তমান শতাব্দীর প্রজন্মের এমন একটি অনুগ্রহ হবে যে, তারা ইহাকে সর্বদা কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় ও দোয়ার সাথে স্মরণ করবে। শেষে ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে, **প্রশিক্ষণের সময়ে সবচে' অধিক জোর দোয়ার প্রতি দেয়া কর্তব্য। অর্থাৎ এসব শিশুদের জন্যে সর্বদা দরদের সাথে দোয়া করা, এসব শিশুদেরকে দোয়া করতে শিখানো এবং দোয়া করার প্রশিক্ষণ দেয়া, যেন শৈশব কাল থেকেই এরা স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের সাথে একটি গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে নেয় এবং এ সম্পর্কের ফল ভোগ করতে আরম্ভ করে। সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে নিজের প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহগুলোকে প্রত্যক্ষ করতে লেগে যায়। তারা বাল্যকাল থেকেই এমন একটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করে নেয় যাদের মুরব্বী সর্বদা খোদাই হয়ে থাকেন এবং দিনের পর দিন তাদের মধ্যে ঐ পবিত্রতা সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় যা কিনা খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক ব্যতিরেকে সৃষ্টি হতে পারে না।** দুনিয়ার কোন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ঐ অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও সূচিতা মানুষকে দান করতে পারে না যা কিনা খোদাতাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান, তাঁর স্নেহ ও তাঁর ভালবাসার ফলশ্রুতিতে সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং এসব **শিশুদের তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণে খুব বেশী দোয়ার মাধ্যমে কাজ নিন। স্বয়ং তাদের জন্যে দোয়া করুন এবং তাদেরকে দোয়াকারী শিশুতে পরিণত করুন।** আমি আশা রাখি যে, এসব পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা জামাতের নিকট অর্পণ করার পূর্বেই এসব শিশু সর্বপ্রকার সৌন্দর্যে মন্ডিত হয়ে থাকবে আর এমন পিতা-মাতা খুবই খুশীতে ভরপুর হয়ে এবং পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এমন একটি কুরবানী খোদার সমক্ষে উপস্থাপন করে থাকবে যাকে তারা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী সুসজ্জিত করে এবং গড়ে তুলে খোদার সকাশে উপস্থাপন করে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এসব উত্তম চাহিদাগুলোকে পূরো করার সৌভাগ্য দান করুন।

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯, হল্যান্ড]

স্মরণ রাখুন !

শিশুদের তরবীয়তের জন্যে

প্রথমে আপনাদের নিজেদের তরবীয়ত

অবশ্যই করতে হবে

চার

বিষয় নির্দেশিকা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	যতক্ষণ চরিত্রে মাহাত্ম্য সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ কথায় মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না	৬৭
২।	ওয়ালেস আহমদ নোমান নিউম্যানের চেহারায় সত্যতার ছাপ	৬৮
৩।	এক নোমান নয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নোমানের প্রয়োজন	৬৯
৪।	আমাদের কাজ শত্রুকে পরাজিত করা নয়, তার অন্তরকে জয় করা	৭১
৫।	আহমদী নির্বাক ভদ্র হবে না বরং যেন কথা বলতে পারে এমন হতে হবে	৭২
৬।	খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি লোকদের ও জাতিসমূহের মনের কবাটগুলো খুলে দিচ্ছেন	৭৪
৭।	ওয়াকেফীন শিশুদের কী শিখাবেন ?	৭৬
৮।	যেখানে চীনা ও রাশিয়ান ভাষা শেখানোর সুযোগ আছে সেখানে বাল্যকাল থেকেই শেখানো আবশ্যক	৭৬
৯।	যদি দোলনায় থাকা অবস্থায় ভাষা শিখানো যায় তাহলে সর্বোত্তম	৭৭
১০।	লেখা পড়ার কাজে আমাদের ওয়াক্‌ফে নও বালিকারা বেশ কাজে আসতে পারে	৭৮
১১।	বাল্যকালেই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা হোক, দেরী হয়ে গেলে খুব পরিশ্রম করতে হবে	৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে যেখানে আমি আহমদী জামাতকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রতি ধারাবাহিকতার সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি সেখানে সাথে সাথে এ কথার ওপরেও জোর দিয়ে আসছি যে, আপনাদের চরিত্রকে মাহাত্ম্যপূর্ণ করার চেষ্টা করুন। কেননা, কুরআন করীম থেকে বহুবার বিভিন্ন স্থানে এই সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, **যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্রে মাহাত্ম্য সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কথায়ও মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না। আর দোয়ায়ও মাহাত্ম্য দৃষ্টি হতে পারে না।**

কুরআন করীমের এক স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, তোমাদের দোয়া আকাশে সম্মানিত হতে পারে না, আকাশে উত্থিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চরিত্র উহাকে উন্নীত না করে। এতে দোয়ার কবুলিয়তের ব্যাপারে অতি গভীর রহস্য নিহিত আছে। আবার অন্য এক স্থানে কোন এক উপলক্ষ্যে বলেছেন, সুন্দর কথা খবুই ভাল। এতদ্ব্যতিরেকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ সম্ভবপর নয়। কিন্তু শর্ত এই যে, সাথে সাথে আমল ও কর্ম যেন ভাল হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে এ উভয় বিষয়-বস্তু একই কেন্দ্রীয় দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দোয়ার প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা অর্থাৎ মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্র সাথে থাকলে খোদাতাআলা তখন তখনই কথা শুনে থাকেন। আর এ ছাড়া দোয়ায় শক্তি সৃষ্টি হয় না, তাই বান্দা কীভাবে তোমাদের কথা শুনবেন। যে খোদার তুলনায় কম কৃপাময় ও করুণাময়, কম দৃষ্টিদানকারী, খোদার তুলনায় খুবই কম অর্থাৎ আসলে কোন তুলনাই হয় না, তোমাদের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষাকারী-আল্লাহ্ তো কতক দুশ্চরিত্রবানেরও দোয়া শুনে থাকেন। কখনও অসৎ কর্ম করে এমন লোকের দোয়াও শুনে থাকেন কিন্তু বান্দাদের মধ্যে ইহা খুবই কম পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। স্বয়ং তাদের কর্ম যা-ই হোক না কেন, যদি ভাল কাজের প্রতি আহ্বানকারীর মধ্যে স্বল্প পরিমাণ দুর্বলতাও পায় তাহলে তাদের অধিকাংশই ঐ দুর্বলতাকে সমক্ষে উপস্থাপন করে দেয়। তার সারাটা ভাল কাজ এ কারণে বাতিল করে দেয় এই বলে যে, এ বক্তার মধ্যে এই মন্দ পাওয়া গিয়েছে। তাই কুরআন করীম থেকে যখন ইহা জানা গেলো যে, মৌলিকভাবে দোয়ার সাথে মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্র সম্পৃক্ত, আর খোদার করুণা অসীম হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌তাআলা তো যখন চান, যার জন্যে চান দোয়া শুনতে পারেন-একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু বান্দা সাধারণতঃ কঠিন অন্তঃকরণের অধিকারী হয়ে থাকে, অধিক পরিমাণে খুঁত খুঁতে হয়ে থাকে অথচ তার ওপরে ঐ ভাল কথাই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে যার সাথে মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্র মজুদ থাকে। তাই মুবাল্লিগ হওয়ার জন্যে জামাতকে নিজেদের চরিত্রের গুণগত

মান উন্নত করা খুবই আবশ্যক। আর যেখানে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় সেখানেই আমার মধ্যে এ চিন্তা আরম্ভ হয় যে, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌কারী নিজের কোন পবিত্র পরিবর্তন সাধনও করেছে না করে নি। যেখানে করে থাকে সেখানে ফল ধরতে আরম্ভ করে। যেখানে এ প্রসঙ্গে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় না-- ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও নয় আর ব্যক্তিগত ভাবেও নয় সেখানে তালিকাসমূহ তো প্রণীত হয়ে থাকে কিন্তু তাতে ফল ধরে না। এ বিষয়ের গুরুত্ব আমি আমার বিগত ওয়েল্‌স (Wales) ভ্রমণে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছি।

ওয়েল্‌সে কয়েকদিনের জন্যে গিয়েছিলাম। সেখানে এলাকার সম্মানিত লোকদের একটি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করেছিলো জামাত। আমার সাথে বা পার্শ্বে সেখানকার শহরের খুবই জনপ্রিয় বন্ধু ও মেয়র বসেছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আপনি ইতঃপূর্বে এখানে যে সভার আয়োজন করিয়েছিলেন যাতে কুরআন করীমের ওয়েল্‌স ভাষায় অনুবাদের যে আবরণ উন্মোচন করা হয়েছিলো, এতে লম্বা ধরনের একজন ইংরেজ ছিলেন এবং ইয়ার্কশায়ার থেকে এসেছিলেন, তিনি কে ? আমি তাকে বল্লাম, তিনি ছিলেন নোমান নিউম্যান। তিনি ওয়েল্‌সের সাথেই সম্পর্ক রাখেন এবং ওয়েল্‌স আহমদী। আর সম্ভবতঃ এদিক থেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার অধিকারী যে, তিনি প্রথম ওয়েল্‌স আহমদী। এর পরে এক দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বারে বারে ইহাই বলতে থাকেন যে, **এ ব্যক্তির চেহারায় এমন সততার ছাপ ছিলো এবং এ সততার এমন গভীর প্রভাব আমার হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তার সাথে কথা বলতে বলতে আমার এই দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, এ ব্যক্তি সত্যবাদী আর যে কথা বলছিলো তাতে ধোঁকা হতে পারে না**। তিনি বল্লেন, এ ব্যক্তি আমার প্রাণে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করলো যদিও সামান্য কথা-বার্তাই হয়েছিলোঃ কিন্তু যখন তার চাল-চলন দেখলাম, তার কথা বলার ধরন দেখলাম, তার চোখের ভিতর আলো দেখলাম তখন আমার নিকট আপাদমস্তক, সত্য দেখা দিলো। তিনি বল্লেন, তখন থেকে নিয়ে আমি প্রত্যেক বৈঠকে ইহা বলে থাকি যে, তোমরা যে কতক মুসলিম দেশের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ইসলামকে দোষারোপ (Condemn) করে থাকো ইহা ঠিক নয়। এস্থলে আমি তাদেরকে বলি, আমি এমন মুসলমান দেখেছি যাদের নিকট থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো, যা কিনা কৃতিত্ব ও চরিত্রের দিক থেকে একটি মার্গ ও একটি দৃষ্টান্ত। এজন্যে গাম্ভীর্যের সাথে ইসলামের ব্যাপারে উহার সত্যতা যাচাই করার প্রতি দৃষ্টি দাও আর এতে তোমরা অনেক সত্য কথা অবহিত হতে পারবে। আবার তিনি আমাকে বল্লেন, যে সব পুস্তক আমাকে দেয়া হয়েছিলো আমি ওগুলো পড়ছি এবং ভবিষ্যতের জন্যে আমি ইহা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, আমার রাজনৈতিক কৃতিত্ব ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকলেও আমি এতে উৎসাহ নিবো। আর লোকেরা ইহা বলতে

আরম্ভ করেছে যে, এতো মুসলমানদের প্রতি ঝুঁকে গেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও যে, এখানকার কতক লোক এমন মুর্খ যে, যখন আমি তাদেরকে বুঝাই তখন তারা ইহা বলে দেয় যে, তোমার ওপরে শয়তানের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আমি তাদেরকে বলি যে, তোমাদের মুর্খতাই আসলে শয়তানী প্রভাব। কেননা, সত্যের অন্বেষণ না করা আর সত্যের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা এবং এ সম্ভাবনাময় পথকে সবসময়ের জন্যে বন্ধ করে দেয়া এই বলে যে, তোমাদের নিকট ছাড়া অন্য কোথাও সত্যকে লাভ করা যেতে পারে না, মুর্খতা। তিনি বল্লেন, আমার নিকট ইহা শয়তানী কার্যকলাপ। আর আসলেই এ কথা ঠিক।

তাই নিষ্ঠাবান আহমদী এই যে সুপ্রভাব ছড়ালেন এ ব্যপারটি ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয় নি বরং তিনি মশালবাহীতে পরিণত হলেন আর প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে খোদার আশীষক্রমে বড় বড় ভাল সমাবেশে একথা পৌছাতে ছিলেন এবং আল্লাহ্‌তাআলার আশীষক্রমে ঐ বন্ধু, যিনি এ মজলিসে এসেছিলেন তাঁর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আমি দেখেছি, উৎসাহ দেখেছি এবং অধিক সংখ্যক লোক এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, আমরা উৎসাহকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাই এবং সাময়িক সাক্ষাৎকারে হবে না বরং আমরা ইনশাল্লাহ্‌ (ইনশাল্লাহ্‌ তো তারা বলেন নি। আমি নিজ থেকে বলছি) আমরা অবশ্যই জামাতী পুস্তক-পুস্তিকা পড়বো। সুতরাং এক বন্ধু, যখন আমরা দ্বিতীয় দিন রওয়ানা দিয়েছি, স্বল্প সময়ের জন্যে পথে আমাদের বাধা দিলেন। সেখানে তিনি আহমদী বন্ধুকে বলেছিলেন যে, যখন তিনি আসেন অবশ্যই যেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করানো হয়, আমি তাঁর সাথে ছবিও উঠাবো এবং কথাও বলবো। সুতরাং তিনিও এমনি ধরনের পুণ্য বাসনার কথা বল্লেন। তাই জামাতের জন্য যে উৎসাহ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে উহার (ইসলামের) জন্যে একটি মহান দরজা খুলছে আর ইহাই ঐ পথ যদ্বারা আসলে লোকদের ইসলামে প্রবেশ করতেই হবে। আশে পাশে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বহু মুসলিম দেশ তাদের মূর্খতাপূর্ণ আইনের কারণে ইসলামের বদনাম করেছে এবং, যেসব রাস্তা দিয়ে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে পারতো স্থানে স্থানে এসব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই দরজা যদি থাকে তো আহমদী জামাতের দরজাই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ দরজাকে ব্যাপকতর করা একটি মৌলিক বিষয়। আর এই দরজা এ রকম তো নয় যেভাবে আমাদের মসজিদের সামনের দরজা রয়েছে অথবা আপনাদের ঘরের দরজা রয়েছে। ইহা একটি প্রতীকী দরজা যা কিনা ব্যাপকতর হতে পারে। আর এ ব্যাপকতা আহমদীদের মহান ব্যক্তি-চরিত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করা উচিত, নচেৎ এ দরজা সংকীর্ণ থাকবে, খুলবে না। **এক নু'মানের প্রয়োজন নয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নু'মানের প্রয়োজন। তারা বিভিন্ন দেশে জন্ম নেয় এবং নিজেদের মহান চরিত্র দ্বারা**

লোকদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করে এবং তাদের মনের রাস্তা দিয়ে লোকেরা পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে তাদের চোখের রাস্তা দিয়ে লোকেরা পুনরায় ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ অধ্যয়ন করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্‌গণের প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এ জাতির দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্, যাদের কথা আমি বলছি, তাদের সাথে যেন তাদের চরিত্রের একটি সুন্দর আকর্ষণী শক্তি থাকে। কতক লোক ইহা বলে দেয় যে, আমাদের চরিত্র সঠিক আছে। আমরা নামায পড়ে থাকি, আমরা মিথ্যা কথা বলি না, আমরা কারও অধিকার খর্ব করি না আর ইহাই তবলীগ, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। ইহা দূর করা আবশ্যক যে, কুরআন করীমে চরিত্রের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করা সত্ত্বেও সুন্দর বাচনকে প্রথমে রেখে দিয়েছে। **'ওয়া মান আহসানু কওলাম্ মিম্মান দা'আইল্লাল্লাহ্** (এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করার চেয়ে কার কথা সুন্দর) অথচ নির্বাক ভদ্রতার নাম দেয়া হয় নি। নবীদের যে ইতিহাস আমাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে এতে কোথাও নির্বাক ভদ্রতার উল্লেখ করা হয় নি। বরং প্রকৃত কথা এই যে, যদি ভদ্রতাকে দেখে আর তা নির্বাক হয় তাহলে বিরোধিতা ও মুখালেফাত শেষ হয়ে যেতে থাকবে আর লোকেরা এ সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকবে যে, তোমরা ভদ্রতার জীবন-যাপন করো, কিন্তু মুখে কিছু বলবে না আমরা তোমাদেরকে কিছু বলবো না। সুতরাং দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ কেবল চরিত্রের মাহাত্ম্য থেকে পূর্ণতা লাভ করে না। এজন্যে জিহ্বার সঠিক ব্যবহারও আবশ্যকীয়। আর এর ফলশ্রুতিতে ভদ্রতা বজায় থাকা সত্ত্বেও আবার মুখালেফাত আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু যারা ভদ্র হৃদয়ের অধিকারী তাদের ওপরে ভদ্রতা জিতে যায় যা কিনা খারাপ কর্মানুষ্ঠানকারী লোক বা বক্র হৃদয়ের অধিকারী লোক তারা অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু মৌলিক কথা ইহাই যে, এমন সব দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্‌দের আবশ্যক, যাদের জিহ্বায় সুন্দর কথা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবাহমান থাকে আর সুন্দর কথা বুঝাতে গিয়ে আমি ইতঃপূর্বে অনেক কথা বলেছি। এতে দলিল-প্রমাণের কোন কথা নেই, এতে কেবল সুন্দরভাবে কথা বলার বিষয়টি রয়েছে। অর্থাৎ এমনভাবে কথা বলা হয় যাতে প্রাণের আকর্ষণী শক্তি থাকে। সুতরাং কথায় প্রাণকে আকর্ষণকারী শক্তি থাকুক, কর্ম হোক উন্নত মার্গের ও সুদৃঢ় আর কর্ম এমন হোক যেন লোককে নিজের দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে নেয় তাহলে বিশ্বের কোন শক্তি ইসলামের মোকাবেলা করতে পারে না। দু'টি শর্ত খোদাতাআলা আরোপ করে দিয়েছেন। এর পরে বলেছেন, যাও মাঠে সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে। ঐ যে তোমাদের প্রাণের শত্রু, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এ আয়াত আরও বলেছে যে, তারা তোমাদের প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হবে। কিন্তু আরও একটি শর্তের সাথে ইহাকে সংবদ্ধ করা হয়েছে যে, ধৈর্যকে সদা সাথে রাখতে হবে। যে লোক ধৈর্যের সাথে ঐসব কথার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর কথা দ্বারা মনোমুগ্ধকর কথার মাধ্যমে লোকদের নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে আর তার কর্ম তার

কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না এবং শক্তি প্রদানকারী হবে তার জন্যে এ শুভ সংবাদ যে, যদি সে ধৈর্যের সাথে ইস্তেকামত (সুদৃঢ় হয়ে থাকে)-এর সাথে এ পদ্ধতির ওপরে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে তাহলে তার জন্যে সফলতাই সফলতা এবং শত্রুর প্রসঙ্গে অবশ্যই বলেছেন যে, তাদের কথা ও উত্তম কর্ম দেখা সত্ত্বেও শত্রুরা শত্রুতা করে থাকে। তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, উহার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও শত্রুদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা আমার কাজ আর আমরা শত্রুদের হৃদয়ে করুণার প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত করে দেবো এমনকি ঐ সব লোক যারা তোমাদের রক্ত-পিপাসু ছিলো তোমাদের জন্যে রক্ত ঝরাতে নিজেরা গর্ব অনুভব করবে-কতই না মহান বাণী! এবং কত সংক্ষিপ্ত কথায় খোদাতাআলা এ গোটা বিষয়-বস্তুকে যা কিনা সমুদ্রতুল্য একটি কুঁজোর মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন।

সুতরাং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্দের জন্যে ইহা আবশ্যক যে, সত্ত্বর তারা তাদের কর্মের ব্যাপারে আত্ম-বিশ্লেষণ করে এবং তাদের কথা বলার ঢং-এরও বিশ্লেষণ করে। অনেক মুবাল্লিগকে আমি দেখেছি যারা সারা জীবন তবলীগ করে কাটিয়েছেন কিন্তু তাদের কথা খোঁচা মারা হয়ে থাকে। তারা পরে যদি কোন কড়া কথা শুনতে পায় বা কথার মধ্যে ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি হয় তখন তারা মনে করে যে, শত্রুকে হাড়িয়ে দেয়া আমাদের কাজ; **যদিও শত্রুকে পরাজিত করা অবশ্যই কাজ নয়। শত্রুর মন জয় করা আমাদের কাজ। "ফাইযাল্লাযী বায়নাকা ওয়া বায়নাহু আদাওয়াতুন কাআন্নাহু ওয়ালীউন হামীম"**- অর্থাৎ ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে আর তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে (৪১ঃ৩৫)। খোদাতাআলা তবলীগের এই উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর ইহা কতই না বিরাট উদ্দেশ্য ! ইহা বলেন নি যে, পরে তোমরা শত্রুকে পরাজিত করার পরে পরাজিত করে যেতে থাকো। বলেছেন যে, পুনরায় ইহা হবে এবং ইহা হতেই হবে যে, কঠোর শত্রুও তোমাদের ভালবাসার পাত্র ও প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হবে।

যাকে আপনি বন্ধু বানাতে চান তাকে কর্কশ কথা দ্বারা বন্ধু বানানো যেতে পারে না। ঘরে আমি শিশুদের মধ্যে দেখেছি, যখন কথা-বার্তা চলতে থাকে যদি কোন এক শিশু অপর এক শিশুর সাথে কর্কশ কথা বলে তখন অন্যজনও কর্কশ ভাষায় জবাব দেয়, এমন কি কখনও ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। একে অপরকে হাতের নাগালে যা পায় তাই দিয়ে মারতে আরম্ভ করে। তাই যে লোক প্রথম থেকেই আপনার প্রাণের শত্রু তার সাথে আপনি কর্কশ ভাষায় কি করে প্রতিযোগিতা করবেন। তার মধ্যে যে মন্দ প্রবণতা রয়েছে ওগুলোতে আপনি আরও আগুন লাগিয়ে দিবেন, তার মধ্যে বিরোধিতার যে তেল রয়েছে উহাকে ম্যাচের কাঠি দিয়ে জ্বালাবেন। এজন্যে কুরআন করীমে খুবই সুন্দর ও খুবই

পরিপূর্ণ কথায় বলেছে। বলেছে, এসকল কিছু করো কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে দৃষ্টি-পটে রাখতে হবে যে, তোমাকে শত্রুর মন জয় করতে হবে এবং সুন্দর সুন্দর কথা এসব কিছুর পরিচিতিই বহন করে। সুন্দর সুন্দর কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা বিতর্কে জয় লাভ করে ফেলো, বিতর্কে জয় লাভ করার ফলশ্রুতি দ্বারা যে অন্তরকে অবশ্যই জয় করা হবে তা বুঝায় না। কখনও কখনও বিরোধিতাকে বাড়িয়ে দেয়। কখনও কখনও শত্রু মাথা হেঁট হয়ে গেছে বলে মনে করে। নিজেকে নিজে লাঞ্ছিতও মনে করতে থাকে এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিরোধিতাকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। (আল্লাহ্) বলছেন, তোমাদের কথা বলার ভঙ্গী সুন্দর হওয়া উচিত অর্থাৎ মন যেন জয় করা যায় এমন কথা, আর কর্মের ব্যাপারে তো আগেই আমি বলে দিয়েছি। **ওয়া আমালা সলিহান** অর্থাৎ কর্ম যেন সুন্দর হয়- তাই কথার মধ্যে না কেবল ইহাই থাকে যে, অধিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় বরং ভাব-গাম্ভীর্যও সৃষ্টি হয়, ইহা ছাড়া সুন্দর কথা শাসবিহীন হয়ে থাকে, এর মধ্যে আকর্ষণী শক্তি থাকে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রয়োজন তো আছেই কিন্তু এখন জাতিগতভাবে নতুন শতাব্দীর সাথে এত বিরাট বিরাট রাস্তা উন্মোচিত হচ্ছে যে, এখন কেবল এ প্রশ্ন নয় যে, আমাদের দরজা খুলি, **খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি লোকদের ও জাতিসমূহের মনের কপাটগুলো খুলে দিচ্ছেন**। আর এমন কতক জাতির সাথে জামাতে আহমদীয়ার সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়েছে যাদের সাথে ইতঃপূর্বে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্যে কোন দরজা খোলা যায় নি। দাবী আসা আরম্ভ হয়েছে চীনের দিক থেকে, আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো তা না হলে কার্যকরী প্রমাণিত হতো না অথবা ফলদায়ক প্রমাণিত হতো না।

ধারাবাহিকতার সাথে ঐসব লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই ছিলো না। কিন্তু এরও সূচনা ছিলো একজন উত্তম আহমদীর উন্নত মার্গের ফলশ্রুতি। একজন চীনা অফিসার, এক চীনা স্কলার (পণ্ডিত ব্যক্তি) দেশের বাইরে এসেছিলেন। একজন প্রফেসর দেশের বাইরে এসেছিলেন। এভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় - **তিনি এমন একজন আহমদীকে দেখেন। তাকে তিনি একটু ভিন্ন-ধর্মী পান। আর তিনি এমন আহমদী ছিলেন যার ভদ্রতা নির্বাক ছিলো না বরং কথা বলতে পারতেন**। তার কাজ-কর্মে তিনি মুগ্ধ হন। তিনি কথায় কথায় তাকে বলতে আরম্ভ করেন যে, আমি কেন ভিন্নতর। আমাদের চারিত্রিক বিধি-বিধান রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে যার আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে তুমি আমার মধ্যে একটি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো। সুতরাং ইসলামের পরিচিতি আহমদীয়তের পরিচিতি আর উহা ফলস্বরূপ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত যা আমার সম্মুখে রয়েছে। যেহেতু তিনি বড় মাপের প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চীন থেকে সম্পর্ক সৃষ্টি করা আরম্ভ করেছেন। প্রথম প্রথম এসব সম্পর্ক নেতিবাচক ফল সৃষ্টি করলো এবং তাকে খুবই কড়াকড়ির

সাথে এ নির্দেশ দেয়া হলো যে, সাবধান, কখনও এ দলের নিকটবর্তী হয়ো না। এতো খুবই মারাত্মক দল। আর এরা হলো মুরতাদ। যেসব কথা তিনি শুনেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। আমিও তার পিছু ছাড়লাম না। সুসম্পর্ক বজায় রাখলাম। আপনি এক পক্ষের কথা শুনে দমে যাবেন না। শত্রু কি করে থাকে। খোদাতাআলা হেদায়াতের পথে শয়তানকে লাগিয়ে রেখেছেন। সে ধ্বনি দিতে থাকে আর বলতে থাকে, ইহা সঠিক পথ নহে। এদিকে এস, এদিকে এস ! কানের মধ্যে কথা ফুঁকতে থাকে। অতএব পর্দা বা পিঠের পিছনে কথা বলতে থাকে এবং তাকে বলতে থাকে যে, অন্যদের সাথে কথা বলার কোনই আবশ্যকতা নেই। তুমি আমাদের কথা শুন এবং মনে করে নাও যে, এসব শয়তানী লোক। তাদের নিকটেও যাওয়া উচিত নয়। এজন্যে আপনি বই-পুস্তক অবশ্যই পড়ে নিন। তাদেরও সুযোগ দিন আমাদেরও সুযোগ দিন। সুতরাং কতক জিনিস তাকে পাঠানো হয়। তিনি পাঠ করেন আর তার মনের চেহারা সর্বৈব বদলে যায়। তিনি দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করেন এবং এখন আমার নিকট এই খবর এসেছে যে, যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে এসব লোকেরাও সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেছে এবং তাদের কতক প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ তাকে লিখেছে যে, আমরা এখন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তাতে ইহা জানতে পেরেছি যে, ইহাই ঐ জামাত যা কিনা আসলে ইসলামের পতাকাবাহী আর আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইহা ধরা পড়ে যে, এই জামাতই শান্তিপ্রিয় এবং তরবারীর দ্বারা নয় বরং ভালবাসা দ্বারা ও কথার দ্বারা অন্তরকে জয় করার নীতি বহন করে এবং ইহা তাদের চরিত্র। এজন্যে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে এবং কতক লোক সেখান থেকে চেষ্টা করছে যে, যত সত্ত্বর সুযোগ আসে তারা এখানে আসে। কিছুদিন এখানে কাটায় এবং জামাতের ব্যাপারে আরও জ্ঞান লাভ করে। এমনিভাবে খোদাতাআলার ফযলে রাশিয়ায়ও যোগাযোগের দারোদ্‌ঘাটন হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌তাআলা প্রথম থেকেই আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করে আসছেন যে, এসব জাতির জন্যে যে পুস্তকাদির শূন্যতা ছিলো উহাকে পূর্ণ করা আরম্ভ করো। আর বর্তমানে খোদার আশীষক্রমে আমরা পূর্বাহ্নেই ঐ স্থানে দন্ডায়মান আছি। যখনই চাহিদা আসবে তাদেরকে কিছু না কিছু অবশ্যই পৌছানো হবে। বিশেষ করে তাদের ভাষায় কুরআন করীম। কেননা, এর চেয়ে শ্রেয় আর কোন পুস্তক সরবরাহ করা যেতে পারে না। সারা বিশ্বে কুরআনের চেয়ে শ্রেয় আর কোন পুস্তক নেই। তাই আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে আমরা এ প্রসঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছি। অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং মজুদও আছে। এ ছাড়াও আরও পুস্তকাদি প্রণীত হচ্ছে। এসব বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এদের সাথে যদি পরিচয় করানো যায় তাহলে এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদেরকে বলছি; সুসংবাদ দিচ্ছি যে, বহির্দেশ থেকে দরজাসমূহ অবারিত হওয়া আরম্ভ হয়েছে এবং বাধাসমূহ

দূরীভূত হচ্ছে, আপনারা আপনাদের অর্গলকে কেন সংকীর্ণ করে রাখবেন ? এসব উন্মুখ দরজাগুলোর সাথে সাথে আপনারাও যদি আপনাদের কপাটগুলোকে প্রশস্ত এবং ব্যাপকতর না করতে থাকেন তাহলে পরে ইসলামের বিস্তারের দায়িত্ব আপনারা পালন করলেন না এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদেহী করতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি যে, কবাট খোলার অর্থ এই যে, আমাদের Points of contact (যোগাযোগের মাত্রা) ব্যাপকতর হয়। অর্থাৎ এতদ্ব্যতিরেকে যে, এক মুবাল্লিগ বা দশ বা শ' মুবাল্লিগ বা শ' দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ বা হাজার দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত রাস্তায় পরিণত হয় এবং ইসলামের জন্যে লোকদের প্রবিষ্ট করাবার জন্যে নিজেদের অন্তরের পথকে উপস্থাপন করে। লক্ষ সংখ্যায় প্রয়োজন। আর হাজার স্থানে এসব যোগাযোগ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আমি যেভাবে পূর্বেও বার বার বলেছি যে, আমাদের এসব জাতির প্রতি দেশের বাইরেও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। দেশগুলোতে যে কবাটগুলো খোলা হয়েছে আর আল্লাহ্‌র আশিসক্রমে খুলছে, এগুলোর সাথে তো আমরা জামাতী ও ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে যোগাযোগ করবো এবং যতটা সৌভাগ্য লাভ হয় এ যোগাযোগকে প্রভাবশালী বানাবো; কিন্তু যখন আমি বলি যে, জাতিসমূহের অর্গল উন্মোচিত হচ্ছে তখন এর অর্থ এই যে, এমনসব অর্গলও রয়েছে যা কিনা এসব দেশের বাইরে অবস্থিত।

কোটি কোটি চীনা লোক দেশের বাইরে জীবন অতিবাহিত করছে। আর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় রাশিয়ার লোক হবে বা পূর্ব কমিউনিষ্ট বিশ্বের লোক, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিজেদের দেশের বাইরে বসবাস করছে। এজন্যে যে প্রবণতা সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে, এথেকে অধিক প্রবণতা এসব দেশের বাইরে সৃষ্টি হওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমেতো যখন আপনি চীনের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন চীনার সাথে কথা-বার্তা বলছিলেন তখন এ ভয় তার ঘাড়ে চেপে বসেছিলো যে, যদি ইহা সত্যও হয় আর আমি ইহা গ্রহণ করেও নিই তাহলে আমার দেশ ইহাকে সহ্য করবে না।

একজন রাশিয়ার লোককে যখন আপনি তবলীগ করবেন তখন সে-ও ভীত হবে। আমার মনে আছে, কলেজ জীবনে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে যখন আমি নিউ হোষ্টেলে থাকতাম, একটি রাশিয়ান প্রতিনিধি দল আগমন করে। আমরা কতিপয় আহমদী ছাত্র মিলে তাদের মাঝে বই-পুস্তক বিলি করার জন্যে গেলাম। আমাদের সাথে রাশিয়ান ভাষায় বই-পুস্তক তো ছিলো না। কিন্তু ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় পুস্তকাদি ছিলো। যেহেতু, তারা ইংরেজী জানতেন, ওগুলো তাদেরকে দিলাম। আমরা সবাই অনুভব করলাম যে, তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সাথে তাদের সহকারী হিসেবে আরও এক ব্যক্তি। হতে পারে তিনি গোয়েন্দা সংস্থার লোক ছিলেন। কেননা, এ দিনগুলোতে বিশেষ করে

যখন রাশিয়ান প্রতিনিধি দল বাইরে যেতো তখন তাদের সাথে গোয়েন্দা অফিসার অবশ্যই যেতো। এখন তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তারা তার প্রতি তাকালো। তাদের চোখে ভীতি ছিলো। তারা বই না নেয়ার জন্যে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তাদের তুলনায় অন্যান্য অনেক লোক বই-পুস্তক নিলেন। যতটা আমার মনে আছে রাশিয়ানরা হয় গ্রহণ করেন নি অথবা ঝট্‌পট্‌ করে আগ্রহবশতঃ এক আধখানা নিয়ে থাকবেন। আমার তো ইহাই মনে আছে যে, তারা গ্রহণ করেন নি। এখন তারা গ্রহণ করেন। এখন দাবী করেন যে, এখন যেখানে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত থাকেন, আমাদের বন্ধুরা যোগাযোগ করেছেন তারা গভীর আগ্রহের অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আফ্রিকা সফরের সময়ে এসব এম্বেসীর একজন দূত তো ছিলেন না, একজন সিনিয়র অফিসার ছিলেন বা ডেপুটি সিনিয়র অফিসার ছিলেন। তিনি আগেই আমাদের প্রকাশিত কুরআন করীম পেয়েছিলেন। খুব প্রশংসা করলেন, এতো উন্নতমানের অনুবাদ যে, মনের ওপরে গভীর দাগ কাটে। তাই রাশিয়ান হোক বা চীনা অথবা তারা এসব দেশে বসবাসকারী হোন সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিলো না এবং এখনও পুরোপুরি সম্ভবপর হয় নি তবে তাদের গোষ্ঠী-জ্ঞাতি যারা বাইরে বসবাস করছেন তাদের নিকট তো আপনারা পৌঁছুতে পারেন। অনেক আহমদী এমন আছেন যাদেরই সৌভাগ্য হয়, এসব এলাকার বাইরের আহমদীদের তাদেরকে নিজেদের মিশনস্বরূপ বানানো উচিত যেন তাদের এসব জাতির মধ্যে ইসলামের তবলীগে প্রবৃদ্ধি ঘটে। আর আমরা ঐ কবাটে পরিণত হই যদ্বারা তারা ইসলামে প্রবেশ করে। অতএব এভাবে ইসলামের কবাট ব্যাপকতা লাভ করবে এবং যত অধিক আহমদী এতে অংশ গ্রহণ করবে ততই এতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হতে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি আবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, এর আগেও করেছিলাম, কিন্তু বন্ধুরা সাধারণতঃ ভুলে গিয়ে থাকেন, এজন্যে কতক উপদেশ বারে বারে করতে হয়। ঐসব নিষ্ঠাবান, ঐ সব সৌভাগ্যশালী আহমদী যারা আগামী শতাব্দীতে নিজেদের সন্তানকে ইসলামের জন্যে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তারা অনেক সময়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমরা এদের কীভাবে গড়ে তুলবো ? তাদেরকে বুঝানোর জন্যে, তাদেরকে পদ্ধতি শিখাবার জন্যে তাদের আরও পথ-নির্দেশনার জন্যে, যথারীতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে। আর তাহরীকে জাদীদকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে, কী প্রকারের পুস্তকাদি তৈরী করতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি কোন্ প্রকারের প্রশিক্ষণমূলক উপদেশাদি প্রণীত হওয়া উচিত। শিশুদেরকে তো তারা প্রশিক্ষণ দিবেন।

আমাদের পিতা-মাতাকে তো এখনই পথ-নির্দেশনা দেয়া দরকার। তারা ইনশাআল্লাহ্‌ তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেবেন। সত্বর তাদের ইহাও বুঝানো দরকার যে, এসব শিশুদের জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বই-পুস্তক তৈরী করা

দরকার এবং বিভিন্ন ভাষায় তৈরী হওয়া দরকার যেন প্রারম্ভ থেকেই যেভাবে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে চাই তাদের ঘরে ঐ রকম প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমি এই উপদেশ দিয়েছিলাম যে, যেসব ওয়াকেফীনে নও পিতা-মাতার ঘরে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে কী শিখানো হবে ?মেয়েদের জন্যে উহা সহজসাধ্য নয় যা কিনা ছেলেদের জন্যে সম্ভব। তাদেরকে কর্মক্ষেত্রের যেখানে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু চাহিদা রয়েছে, আবার তাদের কিছু প্রাকৃতিক চাহিদাও রয়েছে যার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কাছ থেকে আমরা এভাবে কাজ নিতে পারি না যেভাবে প্রত্যেক ওয়াকফে নও ছেলের নিকট থেকে কাজ নিতে পারি। এজন্যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, এসব শিশুদের শিক্ষার অঙ্গণে আগে নিয়ে আসুন। শিক্ষা সম্পর্কিত কাজ-কর্ম শিখান। আর জ্ঞান তো বাড়াতেই হবে। কিন্তু শিখাবার পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা রয়েছে যাকে বি,এড বা এম,এড বলা হয়ে থাকে, এমন সব ডিগ্রী যাতে শিখাবার পদ্ধতি শিখানো হয়ে থাকে এতে তাদের ভর্তি করিয়ে দিন। ভবিষ্যতে যখন বড় হবে তখন তাদেরকে এসব শিখানো হবে। কিন্তু এখন তাদের একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ আরম্ভ করা দরকার। আবার ডাক্তারদেরও প্রয়োজন আছে। খোদাতাআলা সৌভাগ্য দান করলে মহিলা ডাক্তাররাও অনেক বড় সেবা দান করতে পারে এবং খুব গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এ পথেও তারা ইসলামের বাণী প্রচারের কাজে অন্যদের ওপরে প্রাধান্য সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যে আহমদী মহিলাদের ডাক্তার হয়ে নিজের জীবন উপস্থাপন করা উচিত বা এসব শিশুদের ডাক্তার বানানো হোক যারা খোদাতাআলার আশিসক্রমে ওয়াক্‌ফে নও হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে।

এভাবে আমি ভাষার ব্যাপারেও বলেছিলাম। আর আমাদের যেসব ভাষার প্রয়োজন হবে তন্মধ্যে রাশিয়ান ও চীনা ভাষা খুবই গুরুত্ব বহন করে। জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে যেসব ভাষা কম্‌তি রয়েছে এর মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি হলো স্পেনিশ ভাষা। এর দিকে দৃষ্টি দেয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। খোদাতাআলার আশিসক্রমে আফ্রিকার অনেক লোক আমাদের রয়েছে যারা ফ্রেন্স ভাষায় কথা বলে থাকেন। সেখান থেকে অনেক উত্তম ফ্রান্সীস ভাষায় কথা বলার লোক মিলতে পারে। আর পাওয়াও যাচ্ছে খোদাতাআলার আশিসক্রমে। কিন্তু চীনা ভাষায় ও রাশিয়ান ভাষায় আমাদের অনেক কম্‌তি আছে বলে আমি মনে করি। এভাবে ইটালিয়ান ভাষায়ও কম্‌তি আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন ও সবিশেষ প্রয়োজন চীনা ও রাশিয়ান ভাষা জানেন এমন আহমদীদের। এজন্যে যেখানে ঐ সকল যুবক যাদের এ সুযোগ রয়েছে তারা যেন শিক্ষা বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে, তাদের প্রতিও আমার এ উপদেশ যে, তারা যেন দৃষ্টি দেয়। কিন্তু যারা ঐ সব দেশে জন্ম নিয়েছে যেখানে চীনা ও রাশিয়ান

ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ রয়েছে তাদের শৈশবকাল থেকেই এ ভাষাগুলো শেখানো আবশ্যক। আর এম্বেসীর সাথে যোগাযোগ করে তাদের জন্যে কিছু ক্যাসেট প্রভৃতি সংগ্রহ করা যেতে পারে ভিডিও সরবরাহ্ করা যেতে পারে।

শিশুদের যদি ছোট ছোট গল্পের বই প্রভৃতি শিখানো হয় তাহলে উহা মস্তিষ্কে এত গভীরভাবে দাগ কাটে যে, এর পরে শিশুরা ঐসব ভাষা-ভাষীদের মত বলতে পারে। আর বড় হয়ে গেলে ভাষা শিখাবার জন্যে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন মাতৃভাষায় যারা কথা বলে তাদের মত করে বলতে পারবে না। প্রকৃতি ও স্বভাবগতভাবে যে মেধা চিন্তা করতে অভ্যস্ত উহা যদি বাল্যকালে শেখা ভাষা হয় তাহলে ঐ চিন্তা তার জন্যে কষ্টকর হয় না। উহা হয় স্বভাবগত ও প্রাকৃতিক। কিন্তু যদি পরে ভাষা শিখানো হয় তাহলে চিন্তা-শক্তিতে কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা ও কিছু না কিছু বাধ্যবাধকতা থেকে যায় এবং সাবধানে পদবিক্ষেপ সম্মুখে রাখতে হয়। কতকলোক তুলনামূলকভাব ক্ষিপ্রতার সাথেও আগে অগ্রসর হয়। কতক আস্তে আস্তে কিন্তু যা প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত প্রবাহ উহা সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্যে ভাষার ওপর দক্ষ করতে হলে খুব শৈশব থেকেই ভাষা শেখানো প্রয়োজন।

যদি দোলনায় থাকা অবস্থায় ভাষা শিখানো যায় তাহলে ইহাও খুবই ভাল-বরং সবচে' ভাল। এমন দাঈমা যদি পাওয়া যায়, নার্স পাওয়া যায় এবং যাদের নার্স রাখার সামর্থ্য আছে তারা যেন তা রেখে নেয়। যদি চীনা নার্স হয় তাহলে শিশুদের শৈশবে কোলে নিয়ে খেলতে খেলতে চীনা ভাষা শিক্ষা দিতে পারে। রাশিয়ান যার মাতৃভাষা এমন মহিলা নার্স যদি পাওয়া যায় তাহলে তার নিকট শিশুকে সোপর্দ করা যেতে পারে। ইহাতো সামর্থ্য থাকার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু যাদের সামর্থ্য আছে তাদের শিশুদের বাল্যকাল থেকেই রাশিয়ান ও চীনা ভাষা শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে আমি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করছি না যে, আমাদের ১০০ জন প্রয়োজন বা ১০০০ জন প্রয়োজন। আসল কথা এই যে, এরা এত বিরাট জাতি এবং বিশ্বে তাদের এতবড় মর্যাদা লাভ হয়েছে যে, যদি উভয়েই উদাহরণস্বরূপ পার্থিব দিক দিয়ে একত্রিত হয়ে যায় তাহলে সারা বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ তারা যদি এক দিকে হয়ে যায়, আর অবশিষ্ট বিশ্ব তাদের বিরোধী পক্ষ হয়ে যায় তবে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে তাদের পৃথক পৃথক থাকাটাই কোন কোন জাতির জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়। আর তারা শক্তি প্রয়োগ করে ও অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ সৌভাগ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা চালায়। আবার কখনও কখনও ভুল করে এবং উল্টো ফল ফলে। কিন্তু আমাদের সাথে যতটা সম্পর্ক তাদের যুদ্ধ করাতে বা যুদ্ধ না করাতে আমাদের শত্রুতা বা বন্ধুত্বে কোন

ইতর বিশেষ হয় না। ইসলাম উভয়ের জন্যেই সমান। আর ইসলামের বাণী পৌছার জন্যে আমাদের ভাষাবিদের প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রকারের ভাষাবিদের আবশ্যক। যারা লেখায় পারদর্শী, বলায় পারদর্শী, অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখেন, রচনা করার যোগ্যতাও রাখেন এজন্যে যত লোকই হোক না কেন তা স্বল্প। অর্থাৎ ১০০ কোটির কাছাকাছি বা এথেকে বেশী হলো চীনের জন সংখ্যা। আর রাশিয়া ও রাশিয়ান ভাষা জানা লোকও খুবই বহুল সংখ্যায় রয়েছে। এখন আমার পুরোপুরি তো স্মরণ নেই কিন্তু ৫০ কোটি থেকে অধিক হবে যারা রাশিয়ান ভাষা জানে এবং বলে। যদি সমস্ত ওয়াকেফীনও এই ভাষা শিখে নেয় তাহলে উহা বেশী হবে না। পুরুষদেরও শিখান শিশুদেরকে শিখান কিন্তু বালিকাদের বিশেষভাবে শিখান। কেননা, **লেখা-পড়ার কাজে আমাদের ওয়াকফে নও বালিকারা অনেক কাজে আসতে পারে**। তাদের মাঠেও যেতে হবে অথচ তারা রচনার কাজও করবে। তারা ঘরে বসে এ ধরনের কাজ করতে পারে যে, তাদের স্বামীদের নিকট থেকে তাদের পৃথক হওয়ার আবশ্যকতা নেই। এজন্যে তাদের এমন সব কাজ শিখানো বিশেষভাবে প্রয়োজন। বালকদেরতো আমরা শামলিয়ে নেবো। আমরা তাদেরকে জামেয়াতে ভর্তি করাবো। বিশেষ কোন দেশ তাদের জন্যে নির্ধারিত করা হবে। তাই এ ভাষার ওপরে তাদের পারদর্শী বানানোর চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বালিকাদের ওপরে আমাদের এমন এখতিয়ার হতে পারে না আর উপযুক্তও নয় আর ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না যে, এভাবে শৈশবকাল থেকে তাদের পৃথক করে পুরোপুরি জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসা হয়। এজন্যে শৈশবে অবশ্যই পিতা-মাতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে বা পরে স্বামীর অধীনে। এজন্যে **তারা যদি ভাষাগুলো শিখে নেয় তাহলে ঘরে বসে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সেবা প্রদান করতে পারে**। আর যখন ভাষা শিখা হয়ে যাবে তখন যে সময়ে তাদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তাদেরকে আবার **এসব ভাষায় টাইপ করাও শিখাতে হবে এবং এসব ভাষার সাহিত্যও তাদেরকে পড়াতে হবে**। তারা ইহা মনে না করে যে, ভাষায় কথা বলতে পারলেই যথেষ্ট হয়ে যায় অথবা লেখা-পড়ার পদ্ধতি শিখা হলে ইহা যথেষ্ট হয়ে যায়। বই-পুস্তক যতই পড়া হয় ততই ভাষায় দক্ষতা সৃষ্টি হয়। এজন্যে আবার বেশী বেশী সংখ্যায় তাদের রাশিয়ান ক্লাসিকাল নভেল পড়াতে হবে। রাশিয়ান ক্লাসিকাল প্রবন্ধ, ক্লাসিকাল কবিতা, আধুনিক কবিতা এবং চীনা ভাষার বেলায়ও এ কথা খাটবে যেন বাল্যকাল থেকেই তাদের জ্ঞানের পাল্লা এতই ভারী হয় যে, খুবই সহজে এক স্বভাবজ আবেগে স্বয়ং শিক্ষার কাজে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে।

আমি আশা রাখি যে, জীবন উৎসর্গকারীগণ এ কথার ভালবাসা মনে গেঁথে নিবে আর শেষ কথা এই যে, আবারও বলছি তাদেরকে মহান ব্যক্তিত্বের

অধিকারী করা সম্পর্কে এখন থেকেই প্রচেষ্টা আরম্ভ করে দেয়া দরকার। **প্রকৃতপক্ষে বাল্যকাল থেকেই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে খুবই পরিশ্রম করতে হয়।** কথায় বলে, লোহা গরম থাকতে থাকতে বাঁকানো উচিত। কিন্তু এই যে শৈশবের লোহা ইহা খোদাতাআলা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নরমই রাখেন। আর এই যে কুঁড়ি অবস্থায় এর ওপরে যে নক্‌শা আপনারা খোদাই করতে চান উহা স্থায়ী হয়ে যায়। এজন্যে ইহা হলো তরবীয়তের সময়কাল আর তরবীয়তের সাথে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, **পিতা-মাতা যতই চান কথা দ্বারা তরবীয়ত করতে পারেন। যদি তাদের ব্যক্তি-সত্তা ও চরিত্র কথানুযায়ী না হয় তাহলে শিশু দুর্বলতাকে গ্রহণ করবে এবং সুদৃঢ় অংশ পরিত্যাগ করবে।** ইহা দু'টি প্রজন্মের সংযোগ কালে এমন একটি নীতি যার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে জাতিসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হতে পারে আর, ইহা স্মরণ রাখার ফলশ্রুতিতে উন্নতিও করতে পারে। এক প্রজন্ম যখন ভাবী প্রজন্মের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এর মধ্যে সাধারণতঃ এই নীতি কার্যকরী হয়ে থাকে।

শিশু পিতা-মাতার দুর্বলতাকে গ্রহণ করতে ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করে, তাদের কথার প্রতি কম দৃষ্টিপাত করে থাকে। যদি কথা বড় বড় কাজের হয় আর মধ্যিখানে দুর্বলতা থাকে তাহলে শিশু মাঝখানের দুর্বলতাকেই গ্রহণ করবে। এজন্যে স্মরণ রাখা উচিত যে, শিশুদের তরবীয়তের জন্যে আপনারা অবশ্যই নিজেদের তরবীয়ত করুন। এসব শিশুদের আপনারা ইহা বলতে পারেন না যে, ব্যস ! তোমরা সত্য কথা বলো, তোমাদের মুবাল্লিগ হতে হবে। তোমরা অবিশ্বস্ততার কাজ কোর না, তোমাদের মুবাল্লিগ হতে হবে। তোমরা পরচর্চা কোর না, তোমাদের মুবাল্লিগ হতে হবে। তোমরা ঝগড়া-বিবাদ কোর না, আর এসব কথা বলার পরে মা-বাবা এমন ঝগড়া-বিবাদ, আবার এমন নোংরা কথা-বার্তা একে অপরের বিপক্ষে বলতে থাকে, এমন অসম্মানী করে যেন তারা বলে যে, শিশুদের তো আমরা উপদেশ দিয়েই দিয়েছি এখন আমরা নিজেদের ইচ্ছে মত জীবন যাপন করি-ইহা হতে পারে না। তাদের জীবনও যেমন শিশুদের জীবনও তেমনই। যে অলীক জীবন তারা রচনা করেছে যে, ইহা করো। শিশুদের এমন পিতা-মাতার প্রতি এক কানা-কড়িও পরওয়া নেই, যারা নিজেরা মিথ্যে কথা বলে। তারা যতই শিশুকে বলে যে, যখন তোমরা মিথ্যে কথা বলো তখন আমাদের কষ্ট হয়।

তোমরা খোদার জন্যে সত্য কথা বলো কেননা, সত্যতার মধ্যেই জীবন। এক্ষেত্রে শিশু বলবে, একথা তো ঠিকই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মনে করে যে, মা-বাবা মিথ্যেবাদী আর তারা অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেন। এজন্যে দু'টো

সংযোগকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এই নীতি কার্যকরী হয়ে থাকে এবং ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে আপসে শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেসব ইউরোপীয় দেশে আমি বেড়াতে গিয়েছি সকলেই এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, আমাদের প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে আর আমি তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, এ শূন্যতা তোমরাই সৃষ্টি করেছো। তোমরা মৌখিকভাবে উত্তম চরিত্র শেখানোর চেষ্টা করেছো, তোমরা মৌখিকভাবে তাদেরকে উত্তম চরিত্রের কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছো। তোমরা বলেছো, যুবকদের এ ধরনের ধোঁকাবাজী করা ঠিক নয়। এভাবে তোমাদের এ আচরণ করা ঠিক নয়। কিন্তু তোমাদের জীবনে বাস্তবে তারা এসবই দেখছে যেগুলোর ওপরে সামান্য লেপন ছিলো কিছু দেখা যায় এমন চাদরে আবৃত ছিলো আর প্রকৃতপক্ষে এসব শিশু জানতো এবং বুঝাতো যে, তোমরা স্বয়ং এসব ব্যাপারে খুবই উৎসাহ বোধ করে থাকো। এজন্যে তারা তাতেই পরিণত হয়েছে যা কিনা তোমাদের অভ্যন্তরীণ চিত্র ছিলো, আর তোমরা যে শূন্যতা অনুভব করছো তোমাদের বাহ্যিক চিত্র থেকে তা অনুভব করছো। ঐ চিত্র যা তোমরা দেখতে চাচ্ছিলে এগুলোর মধ্যে তোমাদের যে ধ্যান-ধারণা ছিলো তা তোমাদের কর্মের বিশ্বে কোন সুফল প্রকাশ করে নি। এজন্যে তোমরা বাহ্যিকভাবে ইহাকে শূন্যতা মনে করছো যদিও ইহা পারস্পরিক ফলাফল- মন্দের পারস্পরিক ফলাফল। এর শীর্ষসমূহ উচ্চতর হতে যাচ্ছে বা যদি গভীরতর পরিভাষায় কথা বলো তাহলে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং আহমদী জামাতের ভাবী প্রজন্মসমূহের চারিত্রিক অট্টালিকা নির্মাণে সর্বদা এ নীতিকে মনে রাখতে হবে নচেৎ তারা সর্বদা ধোঁকায় পড়ে থাকবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত হতে থাকবে। তারা তাদের কথা মানবে না বিশেষ করে ওয়াকেফীনে নও শিশুদের ওপরে কঠিন দায়িত্বভার রয়েছে। এই যে পাঁচ হাজার বা অধিক শিশু যতই হোক না কেন এ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাদের আগামী বিশ্বকে শামলাতে হবে, ভবিষ্যতে প্রজন্মকে তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন নতুন জাতির চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং ইসলামের নব জীবনের জন্যে, বড় বড় সংগ্রাম করতে হবে, বড় বড় মার্গ অতিক্রম করতে হবে। আপনি যদি এ বিষয়-বস্তুকে ভুলে গিয়ে সাধারণ অমনোযোগিতার অবস্থায় পূর্বতন জীবন যাপন করতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ওয়াকফে নওদের ওপরে আপনার কুপ্রভাবগুলো ছেয়ে যাবে। এরপরে জামাত যতই চেষ্টা করুক না কেন তাদের সে রকম একটা সংশোধন করতে পারবে না। আমি দেখেছি জামেয়াতে যেসব কুঅভ্যাসগ্রস্ত

শিশুরা আসে শিক্ষক অনেক জোর দেয়া সত্ত্বেও এসব কুঅভ্যাসের কিছু না কিছু থেকেই যায়, একেবারে মিটে যায় না। কুঅভ্যাসকে মিটানো খুবই কঠিন কাজ।

একথা ঠিক যে, অভ্যন্তরীণভাবে কতক লোকের মধ্যে একবারে তাকওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায়। পরে আবার এ অভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমে খোদার আশিসক্রমে নিজের সকল অনিষ্টকে নিক্ষেপ করতে পারে যদিও ইহাকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। আমি এখন এমন বিপ্লবের কথা বলছি না। আমি তরবীয়তের নীতির কথা বলছি, যে পর্যন্ত তরবীয়তের সাথে সম্পর্ক রাখে, যদি আপনি এসব ওয়াকেফীনকে উত্তম অবস্থায় এবং সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন অবস্থায় জামাতের সম্মুখে উপস্থাপন করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এ মণি-মুক্তা যোগ্যতার সাথে অতি মহান বিপ্লব সাধন করবে আর জামাত এদের দ্বারা বড় বড় মহান কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে। সাধারণতঃ বক্র স্বভাবাপন্ন শিশুও যদি আসে তাহলে কখনও কখনও ঐ বক্রতা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। কতক প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে যায় উহা অগভীর হয়ে থাকে এবং ইঞ্জিনিয়ার দেখেন যে, বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু কতক গভীর ছিদ্র হয়ে থাকে আর উহা সময়ের সাথে সাথে ফাঁটতেও থাকে আবার ওগুলোর কারণে ছাদও ধ্বসে পড়তে থাকে। তাই মৌলিক চারিত্রিক দুর্বলতাসমূহ ঐসব গভীর ছিদ্রের সাদৃশ্য হয়ে থাকে। যদি ওগুলোকে আপনি একবার সৃষ্টি হতে দেন তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাদ ধ্বংস করে দিলেন। এজন্যে খোদাকে ভয় করতে থেকে ইস্তিগফার পাঠ করতে করতে এ বিষয়-বস্তুকে খুব ভালভাবে মস্তিষ্কে প্রোথিত করে নিন এবং হৃদয়ে গেঁথে নিন আর আপনার চরিত্রে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করুন যেন আপনার এ পবিত্র পরিবর্তন ভাবী প্রজন্মের সংশোধন ও তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে সারের কাজ দেয় এবং ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে যার ওপরে মহান অট্টালিকা নির্মিত হবে। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন, আমীন / তা-ই হোক।

[সাইয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত
৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, মসজিদ ফযল, লন্ডন]

প্রারম্ভকাল কাটিয়াছে মম দিন
তোমারই আশ্রয়ে
তোমারই কোলে,
তোমারই পথে
দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়

পাঁচ

বিষয় নির্দেশিকা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	পাকিস্তান থেকে ইল্যান্ড হিজরতের কল্যাণসমূহ	৮৫
২।	কলীম খাবর সাহেবের জীবন উৎসর্গকরণ	৮৭
৩।	পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি আছে কি যা আমাদের অন্তর থেকে খোদার ভালবাসা উপড়িয়ে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে ?	৮৯
৪।	ওয়াকেফীনে নও-এর যে বাহিনী রয়েছে আগামী ২০ বছরে তাদের ওপরে বড় বড় দায়িত্বভার অর্পিত হবে	৯০
৫।	এদের ওপরে তাই পূর্ণ দৃষ্টি এভাবে দিন যেভাবে একটি খুবই প্রিয় বস্তুকে এক মহান উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে	৯১
৬।	নিজেদের ওয়াকেফীনের সত্তাকে খোদার সমীপে সোপর্দ করুন	৯২
৭।	আমার কেবল ভয় ছোট্ট মনে না করে তাদের গড়তে দেরী করা হয়	৯২
৮।	বাল্যকাল থেকেই ভাষা শিখানো আরম্ভ করুন - পাশ্চাত্য জগতে ইহা খুব সহজসাধ্য	৯৩
৯।	তিনটি ভাষা যেন কমপক্ষে শিখানো হয়	৯৪
১০।	লা ইয়া'লাম ইল্লা হুয়া - তিনি ব্যতিরেকে কেউ অবহিত নয় [হুযূর (আইঃ)-এর একটি স্বপ্ন]	৯৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পরে হুযূর (আইঃ) বলেন, **পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ডে সাময়িক হিজরতের বহু কল্যাণ এমন ছিলো যা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে** এবং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এগুলোর গুরুত্বও প্রকাশিত হতে থেকেছে। এর অনেক কল্যাণের মধ্যে যা কিনা খোদার অমোঘ নিয়তি অনুযায়ী আমাদেরকেও আবশ্যিকভাবে প্রদত্ত হওয়ার ছিলো-যেমন শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো হয়ে থাকে তার রোগমুক্তির জন্যে, তার জীবনের স্থায়ীত্বের জন্যে ঐ ওষুধ আবশ্যক হয়ে থাকে তা যতই তিক্ত হোক না কেন - আল্লাহ্তাআলাও স্বীয় আসিশক্রমে এভাবে আমাদেরকে রহমত ও করুণা চুমুকে চুমুকে পান করিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে একটি এই যে, কতক সেবার এমন ক্ষেত্র দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে যার দিকে পূর্বাহ্নে কোন দৃষ্টি পড়ে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক দীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পরেও প্রাচ্য-জগৎ যাকে কিনা সমাজবাদের জগৎ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রাচ্যের ঐ অংশ যা সমাজবাদের থাবায় পড়েছে, এতে বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষের জন্যে আমরা কোন প্রস্তুতি নেই নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা ইলহামরূপে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাকে রাশিয়ায় বিপুল সংখ্যায় মুসলমান দেবো। তিনি (আঃ) তাঁর এ দৃশ্যকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেভাবে বালির কণা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে রাশিয়ার (রাজ) দণ্ড তাঁর হাতে ধৃত দেখানো হয়েছে যা কিনা স্বপ্নের মধ্যে এমন মনে হয়েছে যেভাবে এর মধ্যে দু'নলা বন্দুক হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন লাঠি যদ্বারা দূরে আঘাত করা যায় বা দূরবর্তী স্থানে প্রভাব বিস্তার করা যায়।

যখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে আসার অমোঘ নিয়তি বা ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার অমোঘ নিয়তি প্রকাশিত হয় নি এসব বিষয়ের ওপরে দৃষ্টি এ অর্থেতো ছিলো যে, ইহা খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শুভ সংবাদ ছিলো আর প্রত্যেক আহমদীর প্রাণ এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলো যে, নিশ্চয় ইহা পূর্ণ হবে; কিন্তু কীভাবে হবে এবং ইহা পুরো করার জন্যে মু'মিনের যে কর্ম-প্রচেষ্টা চালানো উচিত ছিলো তা আমরা কীভাবে আদায় করবো-এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ছিলো না। আর এমতাবস্থায় ইহা সম্ভবপরও ছিলো না। এখানে আসার পরে সর্বপ্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ তো ইহা করার সৌভাগ্য লাভ হলো যে, সমাজবাদের প্রাচ্য জগতে যেসব দেশ রয়েছে তাদের ভাষায় ইসলামের বাণী পৌছানোর জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক-পুস্তিকা তৈরী হওয়া আরম্ভ হয়। কুরআন করীমের কতক পরিপূর্ণ অনুবাদও এসব ভাষায় করার সৌভাগ্য লাভ হয়। আর কতক ভাষায় উদ্ধৃতিসমূহ প্রচার করার সৌভাগ্য লাভ হয়। এমনিভাবে আহাদীসে নবুবী (সঃ)-এর মধ্য থেকে ঐসব

নির্বাচিত হাদীস অনুবাদ ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ হয় যেগুলো বর্তমান যুগের প্রয়োজন পুরো করবে এবং মানুষের চাহিদার দিক থেকে পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে গুরুত্ববহ বলে আমরা মনে করি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু উদ্ধৃতি যা কিনা কুরআন করীমের আয়াত ও আহাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো আর এগুলোর ব্যাখ্যা মজুদ ছিলো ওগুলোকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে নির্বাচিত করার সৌভাগ্য লাভ হয় যে, একজন পাঠক যখন কুরআন করীমের বিষয়-বস্তু দেখে আহাদীসের বিষয়-বস্তুর সাথে পরিচিত হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন তার প্রথম দু'টি লেখায় অধিকতর স্বাদ সৃষ্টি হবে এবং তার মেধা অধিকতর প্রখরতার সাথে এগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করতে পারবে আর তার মাঝে এ অনুভূতিও অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকবে যে, কুরআন করীমের ব্যাখ্যা হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র কথার মধ্যে রয়েছে এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথার ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথার মধ্যে রয়েছে। তাই এভাবে এ সময়ের মাঝে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। কতটা আমরা সৌভাগ্য লাভ করেছি আর ওগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে এবং পুস্তক প্রকাশ করার জন্যে তৈরী হয়েছে। এসব কিছু হচ্ছিলো। কিন্তু কিছুই জানা ছিলো না যে, এসব পুস্তকাদি এসব সাহিত্যাদি এসব দেশ পর্যন্ত পৌঁছানোর কী উপকরণ সৃষ্টি হবে। কেবল ইহাই নয় আরও অনেক বিষয়ে পত্র-পত্রাদি প্রকাশ করা হয়। অনুবাদ প্রস্তুত করা হয় এবং ওগুলোকে ছাপানো হয়। আপনারা খুব কমই অনুমান করতে পারবেন যে, এ কাজ কত কঠিন এবং কত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিলো। কেননা, সঠিক লোককে অন্বেষণ করা এবং তার সাথে যোগাযোগ করা আর তাকে প্রস্তুত করা যে, এ পুস্তকখানা অনুবাদ করুন বা ঐ পত্রিকাখানি অনুবাদ করুন আর এদিকে দৃষ্টি রাখুন যে, ঐ অনুবাদ সঠিক ও আসলের সাথে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যখন কিনা আমরা স্বয়ং এসব ভাষায় একেবারেই অজ্ঞ। এজন্যে উপযুক্ত পন্ডিতগণকে অন্বেষণ করা দরকার। এমন (পন্ডিত) যাদের অনেকেরই আরবীর দিকেও দৃষ্টি থাকে আর তারা ইসলামী পরিভাষাসমূহ সম্বন্ধেও জ্ঞাত হয়। ইহা একটি অতি ব্যাপক কাজ ছিলো ; কিন্তু আল্লাহ্তাআলা সূচনা লগ্ন থেকেই ইহাকে সহজসাধ্য করতে আরম্ভ করেছেন।

আমাদের এক যুবক ইসলামাবাদে রাশিয়ান ভাষা শিখছিলো। তার প্রাণে আল্লাহ্তাআলা একথা জাগিয়ে দিলেন যেন তিনি স্বীয় জীবন ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করেন।

সুতরাং তিনি উৎসর্গ করলেন। আমিও উহা গ্রহণ করলাম। পরে তিনি এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে এসে যান এবং এর পরে ধারাবাহিকতার সাথে তার মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ ব্যাপকতর হওয়া আরম্ভ হয়। প্রথম কাজ ছিলো রাশিয়ান ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ করা। আর ইহাকে আমরা সবাই

গুরুত্ব দিতেছিলাম। তার নাম খাবোর সাহেব। খাবোর সাহেবই বলা হয়। যদিও রাশিয়ান ভাষা কিছু শিখেছিলেন কিন্তু এতটা দক্ষতার সাথে যে, কুরআন করীমের অনুবাদ করতে পারেন ও দায়িত্ব সহকারে করতে পারেন- ইহা একটি বিরাট ব্যাপার ছিলো। কিন্তু প্রাথমিক কাজগুলোতে বেশ সাহায্যকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছেন। আবার আল্লাহ্তাআলা উহার আরও একটি উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এ কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা আপনাদের সম্মুখে রাখছি এথেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, কীভাবে খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি কাজ করে যাচ্ছে। বান্দার হাত তো নড়া-চড়া করে থাকে কিন্তু খোদার হাতের ইঙ্গিতে বান্দার পা সামনে চলতে থাকে এবং খোদা-প্রদত্ত শক্তিতে সম্মুখে এগুতে থাকে। আরও ঐসব বিষয়াদি যা কিনা ধর্মের জন্যে যোগান দেয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়- এসবগুলোর ওপরে যখন আপনি সারা বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি দিবেন তখন আপনি সর্বত্র খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তির কর্ম-কান্ড দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন যে, কীভাবে কখন খোদার অমোঘ নিয়তি কী উপকরণ সৃষ্টি করে দেয় ! সুতরাং ইংল্যান্ডে রাশিয়ান ভাষার এমন দক্ষ পন্ডিত পাওয়া, যিনি আরবী ভাষায়ও পন্ডিত হন বা ইসলামী পরিভাষাগুলো বুঝেন- ইহা ছিলো খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার অপূর্ব মহিমা যে, হিন্দুস্থান থেকে এমন একজন পন্ডিত আহমদী আলেম মিলে গেলো, যিনি রাশিয়ায় রাশিয়ান ভাষায় পি.এইচ.ডি. করেছিলেন। তার পিতা এসব দিনে ঘটনাক্রমে করাচীতে এসেছিলেন। ঐ সময় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম আর তার সাথে কয়েকবার বৈঠক হয়। তিনি এমনিতেই তো নিষ্ঠাবান ভক্ত আহমদী ছিলেন কিন্তু এর পরে তার প্রাণে অসাধারণভাবে আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় যে, আমার ছেলে, যে রাশিয়ান ভাষা শিখে এসেছে সে-ও ধর্মের সেবায় লেগে যাক। সুতরাং তিনি আমাকে পত্র লিখতে আরম্ভ করলেন। এতো ধর্ম থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে। আর আমার খুবই আকাঙ্ক্ষা যে, সে যেন কোন না কোনভাবে ধর্মের কাজে লাগে। সুতরাং তার জন্যে দোয়ারও সৌভাগ্য লাভ হলো, তার সাথে যোগাযোগও হলো এবং ঐ প্রফেসর সাহেব স্বয়ং ইল্যান্ডে আগমন করলেন। নিজের সময় কুরবানী করলেন এবং তার আমলে পরিবর্তন আসলো। ঐ ব্যক্তি, যার সম্বন্ধে তার পিতা বলছিলেন যে, আমি তার অন্তর (ধর্ম থেকে) শূন্য দেখতে পাচ্ছি, তার অন্তর ঈমানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে গেলো, নিষ্ঠাপূর্ণ হলো। তিনি বহু সময় কুরবানী করলেন। দীর্ঘ সময় এখানে থাকলেন। ফিরে গিয়েও ধারাবাহিকভাবে কুরআন করীমের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের কাজে পরিশ্রম করেন এবং এর পরে আমাদের আরও কয়েকজন প্রফেসরকে তা দেখানোর

সৌভাগ্য মিলে, যেন উহা আরও বেশী মার্জিত হয় ও ভাষার দিক থেকে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায় তাহলে তারা যেন তা দূরীভূত করেন।

এভাবে খোতাদাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন অনুবাদ করারও সৌভাগ্য দান করেন আর যেভাবে আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছি অবলীলাক্রমে উপকরণ যোগান দেয়া হতে থাকলো। খাবোর সাহেব- নাম হলো কলীম খাবোর। তিনি কোন এক কাজে কোন একজন প্রফেসরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে গেলেন। তার এক প্রফেসর বন্ধু, যিনি পূর্ব-ইউরোপের কোন এক ভাষার পন্ডিত, সেখানে আসেন। তার সাথে পরিচয় ঘটে। তখন তিনি হঠাৎ তাকে বলেন, ভাই, আমরা তো আপনাকে অন্বেষণ করছিলাম। এভাবে একজন মানুষের অন্বেষণ আর একজন মানুষের সাহায্যে চলতে থাকে এবং যোগাযোগ এমনভাবে সৃষ্টি হতে থাকে যে, যেন ইহা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। যেন এসব পরিকল্পনা আগে থেকে নির্ধারিত করা হয়েছিলো। এই সমগ্র বিষয়ের ওপরে যখন আপনি দৃষ্টি ফিরাবেন তখন কোন বোকা থেকে বোকা ব্যক্তিও ইহা বলতে পারবে না- যদি তার অন্তরে সত্যতার লেশ মাত্র থেকে থাকে তাহলে-এসব হলো অগুণতি কাকতালীয় ব্যাপার। আসলে এসব অমোঘ নিয়তি গুটি চেলে যাচ্ছিলো আর এ সামান্য সময়ের মধ্যে বিস্ময়করভাবে বহুল সংখ্যায় পূর্ব ইউরোপের ভাষাসমূহে ইসলামী সাহিত্য রচনার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। রাশিয়ান ভাষার সাহিত্য প্রস্তুত করার সৌভাগ্য হলো, চীনা ভাষায় সাহিত্য প্রকাশের সৌভাগ্য হলো। আর আমরা অপেক্ষায় বসে আছি যে, এখন দেখুন খোদা ভবিষ্যতে কী উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। পথে অনেক বড় বাধা এসেছিলো কিন্তু এখন দেখুন যে, আপনারা দেখতে দেখতে ঐ প্রাচীর ও বাধা ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। যখন বার্লিনের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছিলো তখন টেলিভশনে লোকেরা ইহা দেখছিলো এবং নিজেদের আশ্চর্য ধরনের আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছিলো ও উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছিলো, তখন আমার প্রাণ আল্লাহ্তাআলার প্রশংসার গীত গাচ্ছিলো। তারা ভাবছিলো তাদের জন্যে বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা হচ্ছিলো। আমি জানতাম যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাতিরে বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা হচ্ছিলো। এখন এসব দেশে ইসলামের বিস্তারের দিন এসে গেছে এবং ঐ প্রস্তুতি যা কিনা খোদার অমোঘ নিয়তি আমাদের দ্বারা করিয়েছিলো উহা বৃথা যাবে না। উহাকে খোদাতাআলা এমনভাবে পূর্ণ করেছেন আর এমন সময়ে পূর্ণ করেছেন যখন কিনা অন্যদিক থেকে বাধাসমূহ ভাঙ্গার উপকরণও প্রস্তুত ছিলো। আর যখনই আমরা এখানে সেবা দানের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছি তখনই খোদাতআলা ঐসব বাধাগুলো দূরীভূত করতে আরম্ভ করেন। **ইনি হলেন জীবন্ত খোদা যিনি আহমদীয়তের খোদা, যিনি সর্বদা আহমদীয়তের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন এবং প্রতি পদক্ষেপে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।**

যাদের দ্বারা আমরা কাজ নেবো আর তারা কোন্ সে ওয়াকেফীন যারা এই নূতন দায়িত্বাবলী পালন করার যোগ্যতা রাখে ? আমাদের নিকট আপাততঃ এসব ভাষার জন্যে এমন পন্ডিতবর্গ নেই যারা সেখানে পৌছে সেবা দান করতে পারে। এজন্যে আমি মনে করি যে, এই প্রথম পর্যায়ে তো পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারের মাধ্যমে অন্তরলোকে ঝুঁকাতে হবে এবং যেভাবে আমি ইতঃপূর্বে বারে বারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, বাইরের জগতের ঐসব লোক যাদের মধ্যে ঐসব দেশের বাসিন্দা যারা হিজরত করে সেখানে বসবাস করছে তাদের জন্যে বিরাট কাজ রয়েছে যে, তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন এবং তাদের মধ্য থেকে ঐসব মুজাহিদ অন্বেষণ করুন যারা খোদাতাআলার আশিস ও করুণায় নিজ নিজ দেশে ইসলামের সেবার আবেগে ভরপুর এবং নিজেদের জীবনকে উপস্থাপন করে, আবার তাদেরকে যে পর্যন্ত প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্যে আবশ্যক সামান্য কিছু শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে **ওয়াকেফীনে নও-এর যে বাহিনী রয়েছে তাদের ওপরে আগামী ২০ বছরে বড় বড় দায়িত্বভার অর্পিত হবে।**

আর এ দিক থেকে আমি জামাতের ঐ অংশকে উপদেশ দিচ্ছি, যাদের খোদাতাআলা ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন আর উহা এই যে, তাহরীকে জাদীদের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের শিশুদেরকে প্রস্তুতিতে আগের চেয়ে অধিক অগ্রসর হয়ে গাম্ভীর্য অবলম্বন করুন এবং অনেক চেষ্টা করে এসব ওয়াকেফীনদের খোদাতাআলার পথে মহান কাজ সাধন করার জন্যে গড়ে তুলুন। খোদার খাতিরে শিশুকে গড়ে তোলা উহা থেকেও অধিক গুরুত্ববহ যতটা ঈদের জন্যে কুরবানীর পশুকে লালন-পালন করে প্রস্তুত করা হয়। আর আমি দেখেছি যে, আমাদের দেশে তো এই রীতি প্রচলিত আছে যে, কতক লোক অন্য সব পুণ্য অর্জন করুক বা না করুক, নামায পড়ুক বা না পড়ুক কিন্তু কুরবানীর জন্যে খাসিটি খুবই আদর করে পোষে এবং এজন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। কখনও কখনও এমন শ্রমিকও দেখা যায় যে, নিজের সন্তানাদির পেট ভালভাবে পুরতে পারুক না পারুক খাসির জন্যে ছোলা বুটের যোগাড় অবশ্যই করে থাকে। কেননা, সে মনে করে যে, ইহা খোদার পথে উৎসর্গীত হওয়ার জন্যে উপস্থাপন করতে হবে। আবার উহাকে সজ্জিতও করে। এর গায়ে কয়েক প্রকার অলঙ্কারও চড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন রং দ্বারা সাজায়। আবার যখন কুরবানী করার জন্যে নিয়ে যায় তখনও অনেক সজ্জিত করে যেন নব-বধু যাচ্ছে-এভাবে সাজিয়ে নিয়ে যায়।

এ শিশু কুরবানীর খাসির চেয়েও অধিক মর্যাদা রাখে। শিশুর পিতা-মাতার এথেকে অনেক বেশী স্নেহ-মমতার সাথে তাকে খোদার সকাশে উপস্থাপন করা উচিত। যতটা ভালাবাসার সাথে খোদার পথে একটি ছাগল যবাইকারী উহাকে

লালন-পালন করে বা খাসিকে লালন-পালন করে উহার অলঙ্কার কী ? উহার অলঙ্কার হলো তাক্ওয়া বা খোদা-ভীতি। তাক্ওয়া দ্বারা ইহাকে সজ্জিত করা হবে। এজন্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে, **ওয়াকফে নও শিশুদেরকে শৈশবকাল থেকেই মুত্তাকী ও খোদা-ভীরুতে পরিণত করুন। তাদের পরিবেশকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাদের সম্মুখে এমন আচরণ করবেন না যাতে তাদের মন থেকে ধর্ম মিটে গিয়ে পার্থিবতার দিকে ঝুঁকে যেতে থাকবে। এদের ওপরে তাই পূর্ণ দৃষ্টি এভাবে দিন যেভাবে একটি খুবই প্রিয় বস্তুকে এক মহান উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে।** আর এভাবে তাদের অন্তরে তাকওয়া পূর্ণ করে দিন এবং যেভাবে একটি জিনিস কারও নিকট সোপর্দ করা হয়ে থাকে সেভাবে এরা আপনাদের হাতে খেলার পরিবর্তে সরাসরি খোদার হাতে খেলতে থাকে। তাকওয়া এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে আপনারা এসব শিশুকে প্রথম থেকেই খোদার নিকট সোপর্দ করতে পারেন এবং মাঝখান থেকে সকল মাধ্যম ও সকল পর্যায় দূরীভূত হয়ে যাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাহরীকে জাদীদের সাথেও সম্পর্ক থাকবে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথেও সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু আসলে শৈশবকাল থেকেই যেসব শিশু নিজেরা খোদার কোলে ঠাঁই নেয়, খোদা স্বয়ং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আর স্বয়ংই তাদের সুব্যবস্থা করেন, স্বয়ংই তাদের পর্যবেক্ষক হন, যেভাবে খোদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পর্যবেক্ষক ছিলেন। তিনি লেখেন,

প্রারম্ভ কাল থেকে কাটিয়াছে মম দিন তোমারই আশ্রয়ে।
তোমারই কোলে, তোমারই পথে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় ॥

তিনি (আঃ) খুবই ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর অতীতকে বিশ্লেষণ করে থাকবেন তবেই তো এ পঙ্ক্তির বিষয়-বস্তু তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চিন্তা করে থাকবেন, শৈশবে দুধ পান করার যুগ পর্যন্ত স্মরণ শক্তি চলে যায়, প্রারম্ভকালে খোদাতাআলার ভালবাসা প্রাণে জাগরূক ছিলো, খোদার সাথে সম্পর্ক প্রাণে ছিলো, প্রত্যেক ব্যপারে খোদাতাআলা হেফাযত করতেন, প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে খোদা পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করতেন আর যেভাবে এক দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিবেদন করেন যে, হে খোদা ! আমি তো সর্বদা তোমার কোলে থাকতাম-সুতরাং এসব শিশুকে খোদার কোলে অর্পণ করো। কেননা, দায়িত্বাবলী খূবই বিরাট এবং কাজ অনেক বেশী। ইসলামের জন্যে যেসব জাতির মনকে আমাদের জয় করতে হবে তাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান, আমাদের পার্থিব শক্তিসমূহ এসব জাতির বুদ্ধি, জ্ঞান ও পার্থিব শক্তিসমূহের তুলনায় কোনই মর্যাদা রাখে না অথচ খোদার জন্যে তাদের মনকে আমাদের জয় করতেই হবে।

সুতরাং একটাই পথ-কেবল একটাই পথ আছে যেন আমরা আমাদের সত্তাকে ও নিজেদের ওয়াকেফীনের সত্তাকে খোদার সমীপে সোপর্দ করি এবং খোদার হাতে খেলতে থাকি অর্থাৎ তাঁর হাতের ক্রীড়ণকে পরিণত হই।

আসল বিষয় এই যে, যে সকল বস্তু যতই দুর্বল হোক না কেন যদি উহা শক্তিশালী লোকের হাতে পড়ে তবে বিস্ময়কর কাজ দেখায়। কোন ব্যক্তি যতই মূর্খ হোক না কেন যদি জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তির হাতে পড়ে তবে তার মাধ্যমে মহান কার্য সাধন করা যেতে পারে। আমরা তো কেবল গুটি। আর এ যোগ্যতাকে সর্বদা হৃদঙ্গয়ম করা ও সর্বদা দৃষ্টি-পটে রাখা আহমদীদের জন্যে আবশ্যক। আপনারা কি দেখেন নি দাবা খেলোয়ারগণ ঐ সবগুটি দিয়ে খেলে থাকে যাদের এমন শক্তি নেই যে, এক ঘর অতিক্রম করে অন্য ঘরে যায় ? বুদ্ধির তো প্রশ্নই উঠে না। চেতনার সামান্য অনুভূতিও মজুদ নেই যে, এগুলো উপলব্ধি করে যে, আমাদের সফলতার ও অমরত্বের জন্যে কোন ঘরে যাওয়া আবশ্যক। আর কোন ঘরে গেলে, পরাজিত হওয়ার ঘোষণা হবে। নিষ্প্রাণ, দুর্বল গুটি চলতেও পারে না। চিন্তা করতেও পারে না। কিন্তু এক জ্ঞানী ব্যক্তি খুব চালাক দাবারু, খেলায় পারদর্শী ওগুলোকে এমনভাবে চাল দেয় যে, বড় বড় বুদ্ধিমানকেও পরাজিত করে দেয় আর পরাজিত ও জয়ের সিদ্ধান্ত এসব নিষ্প্রাণ গুটির চালের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এগুলো না শক্তির অধিকারী আর না বুদ্ধির অধিকারী। খোদার মহান কাজও এভাবে সাধিত হয়ে থাকে। আমরা ঐসব নিষ্প্রাণ গুটিদের মত। আমাদের সম্মুখেও কিছু গুটি রয়েছে। কিন্তু ঐসব গুটির শক্তি শয়তানের হাতে রয়েছে, খোদা-বিমুখদের হাতে রয়েছে আর কিছু গুটি এমনও রয়েছে যে, যারা স্বয়ং নিজেদেরকে নিজেরা খোদা মনে করছে স্বয়ং চলে এবং স্বয়ং চিন্তা করারও সামর্থ্য রাখে। তাদের তুলনায় আমরা নিষ্প্রাণ গুটি যার মধ্যে না কোন শক্তি আছে, না কোন মেধা আছে, কিন্তু আমরা আমাদের খোদার নিয়ন্ত্রণে আছি। এই যে, নম্রতার অনুভূতি যা কিনা সত্যিকার অর্থে বলা হচ্ছে এতে এমন কোন কথা নেই যা নম্রতার খাতিরে বাড়িয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আসল বিষয় এই যে, দুনিয়ার তুলনায় আমাদের মর্যাদা এথেকে অধিক নয়। অবশ্য যদি খোদা চান আর তিনি আমাদের দ্বারা কাজ নিতে আরম্ভ করেন এবং যদি আমরা নিজেদেরকে তাঁর সমীপে সোপর্দ করে দিই তাহলে এই দাবার বাজী অবশ্যই ইসলামের পক্ষে জয় করা হবে। দুনিয়ার কোন শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে এ জয়কে উল্টাতে সক্ষম হবে না। এ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এসব শিশুদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। এদেরকে খোদার সমীপে সোপর্দ করুন এবং যেভাবে আমি পূর্বে বলে এসেছি তাদের ওপরে তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য রাখার সাথে যতটা সম্পর্ক সে বিষয়ে আমি তাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিয়েছি এবং তারা প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। **আমার কেবল ভয় ইহা যে, এখনও তো ছোট্ট শিশু, আর একটু বড় হোক না- ইহা মনে করে এই প্রস্তুতিতে যেন দেরি না করা হয়।**

যদিও শৈশব থেকেই শিশুদের শামলে নিলে তাদের শামলানো সম্ভব। যখন ভুল পদ্ধতিতে বড় হবে এ ভুল পদ্ধতিকে পরে ঠিক করা অনেক পরিশ্রম সাপেক্ষ। জান-প্রাণ শেষ করার উপক্রম হয়। এটাই উপযুক্ত সময় যখন এরা কুঁড়ি অবস্থায় থাকে। এ সময় তাদেরকে যে পদ্ধতিতে চান চালাতে পারেন। এ সময়ে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিন আর এসময়ে তাদেরকে শামলিয়ে নিন এবং সারা **বিশ্বের ওয়াকফে নও-দের প্রতি জামাতের ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি রাখা উচিত আর তাদের পিতা-মাতার সাথে সংযোগ রাখা আবশ্যক। তাদের জানা দরকার যে, আমরা একটি জীবিত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত যদ্বারা খোদার অমোঘ নিয়তি কাজ করে যাচ্ছে-এ অনুভূতি লালন করা দরকার।** এ অনুভূতি তখনই সৃষ্টি হবে যখন তাহরীকে জাদীদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা এসব লোকদের সাথে কার্যকরী ও জীবন্ত সম্পর্ক রাখবে। এবং খোঁজ-খবর নিবে যে, বলো এ শিশুর কী অবস্থা যা কিনা তোমরা খোদার সমীপে সোপর্দ করেছো। কত বড় দায়িত্ব যে, তোমার ঘরে খোদার এক অতিথি রয়েছে। এমনিতে তো আমরাও খোদারই। কিন্তু ইহা এমন এক অতিথি যাকে তোমরা খোদার জন্যে প্রস্তুত করছো। তোমরা কি চিন্তা কর না যে, কীভাবে তাকে প্রতিপালন করছো ? **আমাদেরকে অবহিত করো, আমাদেরকে তার সম্বন্ধে অবহিত করতে থাকে-** তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানাও, তার চাল-চলন সম্বন্ধে, তার রীতি-নীতি সম্বন্ধে জানাও এবং রীতিমত তাদেরকে পথ-নির্দেশনা দাও যে, আমরা চাই যে, এ শিশু থেকে এই কাজ নাও, ঐ শিশু থেকে ঐ কাজ নাও। এ প্রসঙ্গে আমি মনে করি- **ঐসব শিশু যারা বিশেষ করে পশ্চিমা জগতের ওয়াকেফীন ; তাদের আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে অন্য জগতের শিশুদের তুলনায় বিভিন্ন ভাষা শেখার খুব বেশী সুযোগ রয়েছে।** ভাষা শিক্ষা খুবই কঠিন কাজ। ইহা শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হওয়া দরকার। ভাষা শিখানোও অধিক কষ্টকর কাজ এজন্যে বড় বড় পন্ডিতের প্রয়োজন। যারা এ কাজের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন তাদের এবং বড় বড় গবেষণা কার্য কেবল তারাই নয় বরং তাদের অনেক সঙ্গীও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিয়োজিত থাকেন। এমন সুযোগ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে সহজলভ্য। এদিক থেকে তাহরীকে জাদীদের উচিত যে, পূর্ব ইউরোপ ও সমাজবাদী বিশ্বের এসব দেশের জন্যে যেখানে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ বলা হয়ে থাকে এবং পরে চীনের জন্যে আর দ্বিতীয়তঃ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের জন্যে যেখানে পাশ্চাত্য ভাষাসমূহে কথা বলা হয় নির্ধারিতভাবে শিশুদের এখন থেকেই চিহ্নিত করুন। যাকে ইংরেজীতে Ear Mark (চিহ্নিত করা) বলা হয়ে থাকে এবং যদি এমতাবস্থায় তাদের দৃষ্টিতে দশজন প্রয়োজন হয় তাহলে বিশ বা ত্রিশ জন তৈরী করুন। এখন ইহা তো পরিসংখ্যান দেখে সিদ্ধান্ত হবে

যে, কোন দেশের জন্যে কত শিশু তৈরী করা যেতে পারে, কিন্তু এখন থেকেই একাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি পোলান্ডের জন্যে আমাদের কতিপয় শিশু তৈরী করতে হয় তাহলে এমন দেশ থেকে যেখানে পোলিশ ভাষা শেখার সুযোগ রয়েছে, ওয়াকেফীন শিশু নেয়া আবশ্যক। জার্মানীতে আল্লাহ্তাআলার আশিসক্রমে যথেষ্ট জামাত মজুদ আছে। আর জার্মানীর জামাত যেহেতু আল্লাহ্তাআলার আশিসক্রমে কুরবানীতেও খুবই অগ্রগামী, সেখানে এক বিপুল সংখ্যক এমন যুগল আছেন যারা নিজেদের শিশুকে ওয়াক্ফে করেছেন এবং এখনও করছেন। তাই যাদের কোন বিশেষ ভাষা শিখার সুযোগ আছে এমন শিশুদের নিকট থেকে ঐ কাজই নেয়া উচিত যা তাদের জন্যে সমীচীন। এ দিক থেকে জার্মানীর সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক ভাষা রয়েছে। আর জার্মান জাতি ওগুলোর সাথে প্রাচীন ঐতিহাসিক সংযোগ রাখে। আবার ইংল্যান্ডেও বহু ভাষা শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানেও কতক শিশুকে বিশেষ বিশেষ ভাষার জন্যে তৈরী করা যেতে পারে। উত্তর ইউরোপের স্ক্যান্ডেনেভিয়াতেও কতক বিশেষ বিশেষ ভাষা শিখাবার ব্যবস্থা অন্যান্য স্থানের চেয়ে অধিক রয়েছে। সেখানে বিশেষ করে কতক দলকে কতক বিশেষ দেশের জন্যে তৈরী করা যেতে পারে। মোটকথা ইহা এমন একটি কাজ যাকে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না। সকল শিশুর প্রতি পুঙ্খাণুপুঙ্খ দৃষ্টি দেয়ার পরে বালকদের জন্যে ও বালিকাদের জন্যে এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, আমাদের অমুক দেশের জন্যে দশ বা বিশ অথবা ত্রিশ ওয়াকেফীনের জিন্দেগী তৈরী করতে হবে। এর মধ্যে এতজন বালিকা হবে যারা ঘরে বসে লেখা-পড়ার কাজ করে ধর্মের সেবা করতে পারে। তাদেরকে এমন বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করতে হবে। এত বালককে আমরা আল্লাহ্তাআলার আশিসক্রমে ও করুণার সাথে এসব ক্ষেত্রে নিয়োজিত করবো। পুনরায় এদেরকে কেবল ঐ ভাষারই প্রয়োজন নেই যেসব ভাষার জন্যে তাদেরকে তৈরী করা হচ্ছে বরং উর্দূ ভাষারও খুবই প্রয়োজন হবে যেন হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সাহিত্যাদি স্বয়ং উর্দূ ভাষায় পড়তে পারে। আরবী ভাষার অবস্থান হলো মৌলিক। কেননা, কুরআন কারীম ও আহাদীসে নবুবী আরবী ভাষায় বর্ণিত, আরবী ভাষায় শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যকীয় হবে। অতএব তিনটি ভাষাই তো কমপক্ষে রয়েছে, অর্থাৎ এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাষা শিখতে চায় তো যত চায় শিখুক। কিন্তু তিনটি ভাষার কমে তো কোন কথা উঠতেই পারে না। এজন্যে ইহাও বলতে হবে যে, যেখানে তোমরা পোলিশ ভাষা শিখছো বা হাঙ্গেরী ভাষা শিখছো, চেকোস্লাভাকিয়ার ভাষা শিখছো বা রুমানীয়ান শিখছো বা আলবেনীয়ান শিখছো সাথে সাথে অবশ্যই তোমাদের উর্দূ ও আরবী শিখতে হবে আর উহারও, যে পর্যন্ত আমার জানা আছে, এসব দেশে

ব্যবস্থাপনা মজুদ আছে। যদি না থাকে তাহলে তাহরীকে জাদীদকে আমি প্রারম্ভ থেকেই এ উপদেশ প্রদান করছি যে, আরবী ও উর্দূ শিখানোর জন্যে ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করুন এবং সহজ পদ্ধতিতে এমন ভিডিও তৈরী করুন যেগুলোর সম্পর্ক জামাতের সাহিত্যাদির সাথে যেন থাকে। আর ইসলামী পরিভাষাসমূহ যেন এতে ব্যবহৃত হয়। কেননা, যদি আমরা বাজার থেকে ভাষা শিখার জন্যে তৈরী ক্যাসেট নিই বা অডিও ক্যাসেট নিই তাহলে যে ভাষা এতে শিখানো হয়ে থাকে উহার অধিকাংশ আমাদের কাজে আসবে না। এতে তো তারা শিখাবে PORK (শূকর) কীভাবে পাওয়া যাবে ও মদ কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে আর হোটেলে গিয়ে কীভাবে অবস্থান করতে হবে এবং নাচ-গানের ঘর কীভাবে অন্বেষণ করা যাবে। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদানুযায়ী ভাষা তৈরী করেছে। এ ভাষা দ্বারা আমাদের শিশুরা কীভাবে তবলীগ করতে পারে ? এজন্যে ভাষার ধরন তো তারা শিখতে পারে কিন্তু এ ভাষাকে অর্থপূর্ণ শব্দে রূপ দান অবশ্যই জামাতকে স্বয়ং করতে হবে। আর উহা একটি বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে হতে হবে। তাই দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখন এসব শিশু খেলা-ধূলা করছে, কখনও কখনও তাদের ছবি আসছে। তখন জানা যাচ্ছে যে, চার বছর পূর্বে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলো, যে ওয়াকফে জীন্দেগী ছিলো আর সে কথা বলতো, দৌড়া-দৌড়ি করতো এবং তার পিতা-মাতা খুবই আনন্দের সাথে তার ছবিগুলো পাঠাতেন এবং কখনও কখনও সে নিজের হাতে ছোট ছোট পত্রও লেখে, আমাকে এমন সব পত্র লিখে যে, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল আঁকা-আঁকি হয়ে থাকে এবং শিশু মনে করে থাকে যে, আমি পত্র লিখেছি, অথচ এ পত্র খুবই আনন্দ দিয়ে থাকে। কেননা, একজন ওয়াকফে জীন্দেগীর জীবনের প্রারম্ভ থেকেই যুগ-খলীফার সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করার ইহাও একটি রহস্য। তার মনে ভালবাসার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। যা হোক এ কাজ তো হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু তাড়াহুড়ো এজন্যে যে,তাদের শামলানোর জন্যে যে বাস্তব প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন এতে আমার ভয় হয় যে, আমরা পিছনে থেকে না যাই।

এজন্যে এ কাজের প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া উচিত। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদ ওয়াকেফীনে জীন্দেগীদের চূড়ান্তভাবে অবহিত না করে যে, তোমাদের এ কাজ করতে হবে, দু'টি কাজ সম্বন্ধে তো তারা জানেই, দু'টি নয় বরং তিনটি। প্রথমতঃ তাকওয়ার কথা তো আমি আগেই বলেছি। শৈশব কাল থেকেই তাদের প্রাণে তাকওয়া সৃষ্টি করুন এবং খোদার ভালভাসা সৃষ্টি করুন আর যে দু'টি ভাষা শিখা দরকার আরবী ও উর্দূ। উহা তো সবার ওপরে বাধ্যকর। এতে কোন পার্থক্য নেই; নেই কোন বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক আহমদী ওয়াকফে নও আরবীও শিখবে এবং উর্দূও শিখবে। এ দিক থেকে যেখানে যেখানে ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেখানে সেখানে ব্যবস্থা করে এবং প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়া আবশ্যক।

এ বিষয়ের ওপরে দৃষ্টি দিতে গিয়ে যখন আমি ইহা চিন্তা করলাম যে, আমরা তো খোদাতাআলার হস্তে শক্তিহীন ও জ্ঞানহীন ঐসব গুটি যেগুলো দ্বারা দাবার বাজী খেলা হয়ে থাকে। তখন আমার একটি পুরাতন স্বপ্নের কথা মনে পড়লো, আজকার অবস্থার সাথে ইহার হুবহু মিল রয়েছে। আমি ইহা পূর্বে আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি কিনা তা আমার মনে নেই। কিন্তু উহা খুবই হৃদয়গ্রাহী আর এখন উহার যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে তা আরও বেশী ব্যাপক। যেসব দিনে ইরানে বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিলো, মাত্র আরম্ভ হয়েছিলো আর কি অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮ সনের কথা। আফগানিস্তানেও পরিবর্তন এসেছে। ইরানে ইহা এসব দিনের কথা। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি এক স্থানে ভালভাবে দৃশ্য অবলোকন করছি কিন্তু সব কিছু দেখা সত্ত্বেও যেন আমি উহার অংশ নই, মজুদ আছি দেখছিও। কিন্তু দৃশ্য হিসেবে আমাকে এ জিনিস দেখানো হচ্ছে যে, একটি ব্যাপক গোলাকার বৃত্তের মধ্যে যুবকগণ দাঁড়িয়ে আছে আর তারা পর্যায়ক্রমে আরবীতে অনেক যন্ত্র-সঙ্গীতের সাথে একটি বাক্য বলছে এবং পরে ইংরেজী গানের অনুসরণে উহার অনুবাদও-ঐভাবেই যন্ত্র-সঙ্গীতের মাধ্যমে পড়ছে এবং পর্যায়ক্রমে এভাবে অদল-বদল করছে অর্থাৎ প্রথম আরবী পরে ইংরেজী আবার আরবীর পরে ইংরেজী আর ঐ বাক্যটি এখন এ রকম মনে হচ্ছে যেমন কুরআন কারীমের আয়াত- লা ইয়ালামু ইল্লা হুয়া লা ইয়া'লাম অর্থাৎ কেউ জানে না সে ব্যতিরেকে। এ বিষয়-বস্তুটি আমার নিকটে এমনভাবে প্রকাশিত হয় যেন দৃশ্য দেখনো হচ্ছে। আমি সেখানে উপস্থিত আছি কি নেই, একদিক থেকে সম্মুখে এ যুবকরা গেয়ে যাচ্ছে আবার আমার দৃষ্টি পড়ছে ইরাকের দিকে সিরিয়ার কথা আমার স্মরণে আছে। ইরাকের কথা স্মরণ আছে। আবার ইরানের দিকে পুনরায় আফগানিস্তানের এবং পরে পাকিস্তান। বিভিন্ন দেশ পর্যায়ক্রমে সম্মুখে আসছে। আর বিষয়-বস্তু মাথায় এমনভাবে জেগে উঠছে যে, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যেসব আশ্চর্য ঘটনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে, যেসব বিপ্লব এগিয়ে আসছে উহার শেষ উদ্দেশ্য খোদা ব্যতীত কেউ অবহিত নয়, আমরা উহাকে ঘটনাক্রমে ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা হিসেবে দেখছি। আমরা মনে করছি যে, ঘটনাক্রমে ঘটনাগুলো প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্বপ্নে যখন তারা সকলে একত্রিত হয়ে ইহা গাচ্ছে তখন এতদ্দ্বারা এই প্রভাব অধিক শক্তিশালী হয়ে চলছে যে, ইহা ঘটনাক্রমে পৃথক পৃথক সংঘটিতব্য ঘটনাবলী নয় বরং ঘটনাবলীর একটি শৃঙ্খল যা কিনা আমোঘ নিয়তি কর্তৃক সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমরা দেখে চলেছি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে, কী হতে যাচ্ছে। লা ইয়া'লামু ইল্লা হুয়া--আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেউ অবহিত নয়। যার হাত এই অমোঘ নিয়তি সৃষ্টি করছে। এই স্বপ্নই আমি চৌধুরী আনোয়ার হুসায়েন সাহেব, যিনি তখন এসেছিলেন, তাকে আমি শুনিয়েছিলাম। এ আশ্চর্য কথা আমি আরও কতক বন্ধুকে শুনিয়েছিলাম। মনে হয় যে, কোন বড় মহান ঘটনাবলী এসব ঘটনাবলীর নিকটে পর্দা উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায়

রয়েছে। এদের পিছনে পিছনে চলে আসবে। আমরা যে ধারণা করছি রাজনৈতিক আসলে 'ইহা অন্য কিছু যা কিনা খোদার আসল উদ্দেশ্য'- ইহা অন্য কিছুও হতে পারে। তাই আমি মনে করি আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার পরিবর্তনীয় নীতির গভীর সম্পর্ক আছে। তারা সেখান থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছে, এসব পর্যবেক্ষণে আরও এমন কিছু বিষয় প্রকাশিত হয়েছে যে, যার ফলশ্রুতিতে পরের মহান বিপ্লবসমূহ সৃষ্টি হতে আরম্ভ করেছে। অতএব আজ পর্যন্ত যেসব ঘটনাবলী বিশ্বে প্রকাশিত হচ্ছে এক বিশ্বের ঐতিহাসিক এক বিশ্বের বিজ্ঞানী এগুলোকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে অন্যান্য জ্ঞানে উপলব্ধি করে। মু'মিনের জন্যে তো খোদার প্রত্যেক অঙ্গুলী হেলনে অমোঘ নিয়তির দিকে ইঙ্গিত করে থাকবে এবং মু'মিন এথেকে অন্য অর্থ গ্রহণ করে থাকে এবং এসব কিছুর আলোকে নিজেকে নিজে কার্যক্ষম আর নিজেকে নিজে প্রস্তুত করে। অতএব খোদার অঙ্গুলী যে দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে উহা এখন ব্যাপকতর হতে যাচ্ছে আর ঐ ইঙ্গিত হলো এই যে, **সম্মুখে অগ্রসর হও আর মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে গোটা পৃথিবীকে বিজয় করে নাও। কেননা, আজ এ বিশ্ব উহার দরজা তোমাদের জন্যে উন্মোচন করছে। সুতরাং হে ইসলামের বীর সেনানীগণ এবং হে ধর্মের সেবার দাবীকারকগণ ! সুযোগ থেকে উপকৃত হও এবং সম্মুখে অগ্রসর হও এবং সারা বিশ্বকে ইসলামের খোদার জন্যে জয় করে** নাও। খোদা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

[সাইয়্যেদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯, মসজিদে ফযল, লন্ডন]

[illegible]

[illegible]

The Initiative of Waqf-e-Nau

A Collection of Friday Sermons by Hazrat Khalifatul Masih IV

(In Urdu Language)

On 3rd April 1987 Hazrat Khalifatul Masih IV explained that a very powerful divine inspiration suggests that with the dawn of the second century of Ahmadiyyat numberless venues will be opened for the domination of Islam and Ahmadiyyat for which a large number of upright devotees, well versed in spiritual and secular knowledge will be needed to cause a revolution in the field of preaching. To achieve this purpose Huzur announced a splendid initiative. This initiative is known as Waqf-e-Nau. In response many people hastened to offer their children and the initiative was well taken by the Community. Such children are the asset of the Jamaat, who are destined to play an unprecedented role in spreading the name and the faith of the Holy Prophet (P.B.U.H) all over the world.

All the relevant Friday sermons by Huzur, have been collected in this book, in which Huzur has explained in detail the importance of this Tahrik, how to upbring these children, learning of different languages and selection of their future professions embracing programmes from 20 to 30 years.

© Islam International Publications Limited
ISBN 1 85372 549 8

TAHRIK-E-WAQF-E-NAU

A compilation of 5 (Five) Friday Sermons

Delivered by

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV

Translated into Bengali by

Muhammad Mutiur Rahman

Published by Waqf-e-Nau Department

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka, Bangladesh